লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায়

হিমানীশ গোস্বামী




NW3
NW6
W11

লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায়

হিমানীশ গোস্বামী

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
ছবি ভট্টাচার্য
২০৬, বিধান সরনী,
কলিকাতা-৬

প্রুফ দেখেছেন : মণি গুহ

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর :
সুনীল কুন্দগ্রামী
গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দীন স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

লেখকের অন্য বই : বিলিতি বিচিত্রা

উৎসর্গ

লণ্ডনের ফেলে আসা
বন্ধুদের উদ্দেশে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

নতুন সংস্করণ হল, অতএব আমার পুরনো বইটাকে একটু ঘষে মেজে দাঁড় করানো হল। একজন অভিনেতা তরুণ বয়সে যখন তরুণের অভিনয় করেন তখন তাঁর মেকআপের তত প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বয়স বাড়লে তিনি আর তরুণ থাকেন না, ফলে তাঁর চেহারাকে মেরামত করে নিতে হয়। আমি দেখলাম লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়-কেও সেইভাবে খানিক মেরামত করে নেওয়া প্রয়োজন। কিছু কিছু মেরামত করলাম, যদিও একেবারে সার্জারির প্রয়োজন বোধ করিনি। নতুন করে সবটা লিখিছি। এবারে আমার আঁকা ছবি ভেতরে কিছু দিয়ে দিলাম—আরো আকর্ষণীয় করবার জন্য। অবশ্য, আমার ধারণা এতে আকর্ষণ বাড়বে,সত্যি সত্যি কি হবে তা জানি না।

বইটা ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। তারপরেও লণ্ডন আমি দেখেছি—সেটি অন্য একটি বইতে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা ছিল—হয়তো তা হতে কিছু দেরি হবে। এই বইতে যে সমস্ত দ্রব্যমূল্য দেওয়া হল তা প্রায় দশ বারো বছরের পুরনো, অতএব এটা লণ্ডনের আধুনিক গাইড বই হিসেবে পাঠকেরা নেবেন না এটা অবশ্যই ধরে নিচ্ছি।

বইটা এর আগে অন্য প্রকাশক প্রকাশ করেছিলেন। এক বছরের কিছু বেশি সময়ে এর একহাজারী সংস্করণ ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তারপরও দু বছরের বেশি সময় লাগল এ বই প্রকাশ হতে।

ভূতপূর্ব প্রকাশক, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরামর্শক্রমে এই বইটি ছেপেছিলেন বলে আমি জানি। তারপর খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর সাক্ষাৎ হয়নি, হলেও তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের কথা বলেন নি। যদি বলতেন, তাহলে ভূতপূর্ব প্রকাশকই আমার এ বই ছাপতেন এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ!

ভূতপূর্ব প্রকাশক বলতে একটু ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। তিনি ভূতপূর্ব প্রকাশক হলেও সশরীরে বর্তমান। যদিও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেননি, তবুও বর্তমান প্রকাশক এই বই ছাপছেন, এটি আমার কাছে খুবই রহস্যজনক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

ইতি

হিমানীশ গোস্বামী

অক্টোবর, ১৯৬৩

৬/২, কালীচরণ ঘোষ রোড,

কলিকাতা-৫০

রয়্যাল হোটেলের জানালা দিয়ে দেখা যায় লণ্ডন। অর্থাৎ লণ্ডনের একটি পাড়ার একটি অংশ। জানালা দিয়ে মুখ বার করলে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে মুখে—ভালই লাগে। একটু কুয়াসার আভাস। সেই কুয়াসা ভেদ ক'রেও চোখে পড়ে তলাকার রাস্তা এবং গতি। বাস, ট্যাক্সি, মোটরগাড়ি ছুটে চলেছে। ছুটে চলবার প্রতিযোগিতা, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আলোর হুঁশিয়ারী, পুলিসের ব্যস্ততা, লোকেদের রাস্তা পারাপার। এই প্রথম দিনের লণ্ডন। লণ্ডন কেমন জায়গা? আমাদের বন্ধুদের বর্ণনা থেকে কতটুকু বোঝা গিয়েছিল লণ্ডনের?—"না হে, বন্ধুরা যা বলেছে সে রকম মোটেই নয়।" আমার বন্ধু পুলক বসু ঘোষণা করলো জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। ছায়ার রাজ্য—রোদ নেই, লোকেরা ছুটে চলেছে। পাঁচতলার উপর থেকে লোকদের বেশ ছোট মনে হয়। খানিক পরে বন্ধু বললো, "জানো বোধ হয় দার্শনিক ফ্রেডরিক নীটশে বলেছেন, সুখ ব'লে কোনো বস্তু নেই, কিন্তু কেবল ইংরেজরাই তার সন্ধান করে?"

আমি বললাম, "কথাটা মোটেই জানা ছিল না—কিন্তু লণ্ডনের দিকে তাকিয়ে ইংরেজদের খুঁজবার চেষ্টা করো না—ঠকে যাবে, নান্টুদার (সত্যপ্রিয় গুহ) কথা মনে নেই, তিনি বলেছিলেন, লণ্ডনে জার্মান, ইটালিয়ান, চীনে, জাপানী, বার্মিজ, সিলোনিজ, মরিশাসবাসী, ভারতীয়, ফরাসী, পোলিশ, এমন কি গণ্ডায় গণ্ডায় রাশিয়ানও চোখে পড়তে পারে, কিন্তু ইংরেজদের দেখা মেলে না। হয়তো তুমি যাদের দেখছ, তাদের কেউই ইংরেজ নয়। হয়তো লণ্ডনে কোনো দিনই ইংরেজ দেখতে পাবে না একটি।"

পুলক বললো, "সে তো নান্টুদার ইম্প্রেশন, তার মূলে কোনো সত্য নেই।"

আমি বললাম, "আমরা যতটুকু সময় পাব, ইম্প্রেশনই আমরা নিতে পারব। আমরা চিরকাল ইম্প্রেশনই নিয়ে এসেছি। ইম্প্রেশনই সত্য—এ ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়।" পুলক আকাশের দিকে তাকালো।

ছাই রঙের আকাশ। অর্থাৎ আকাশ চোখে পড়ে না, ছাইটাকেই চোখে পড়ে। কুয়াসার সঙ্গে মেশানো ছাই-এর রাশি। তার সঙ্গে মিলিয়ে যেন বাড়িগুলোর রঙ—ছাই রঙের। মানুষের পোশাক—ছাই রঙের, মানুষের ছাতা—ছাই রঙের, এমন কি জানালা দিয়ে দু-একটি গাছ যা দেখতে পেলাম, মনে হল তার পাতাগুলিও ছাই রঙের। এই আশ্চর্য ছাই রঙের দেশ, দেখে বোধ হয় একঘেয়ে লাগে। একঘেয়ে লাগতে বাধ্য। একটু লক্ষ্য করে দেখলাম, লণ্ডনের যেটুকু চোখে পড়ে, চিমনি—সমস্ত বাড়ির উপরে চিমনির রাশি, আর প্রায় প্রতিটি থেকে বেরুচ্ছে কয়লার ধোঁয়া। লণ্ডনে ঘর গরম করবার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার কম। অর্থাৎ শহরটা এখনো পুরোনোই রয়ে গেল।

পুরোনো, পুরোনো···লণ্ডন। আর দেখতে পেলাম, নিচে মোটর-গাড়ির সমারোহ, নতুন বেণ্টলি রোলস রয়েসের শোভাযাত্রা, আর তার সঙ্গে পুরোনো ট্যাক্সির প্রতিযোগিতা। এত পুরোনো সে ট্যাক্সি যে মনে হয় সেগুলো ফেলে দেওয়া চলতে পারে। অথচ তা নয়, লণ্ডনের ট্যাক্সি অমনিভাবেই তৈরি। তার রঙ প্রথম থেকেই ছাই-রঙা, তার চেহারা প্রথম থেকেই কিম্ভুত। হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে, মিউজিয়াম থেকে ঐ গাড়িগুলিকে হঠাৎ বার করে আনা হয়েছে কিউরেটরের দৃষ্টি এড়িয়ে। কিন্তু ভুল ভাঙে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে বুঝিয়ে দেয়, পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ভাল ট্যাক্সি হল লণ্ডনের ট্যাক্সি, কারণ এই ট্যাক্সিতে পাঁচ জন লোক বসতে পারে, কেবল তাই নয়, দুটো কেবিন ট্রাংক এবং তিনটে সুটকেস তাতে ঢোকানো চলতে পারে যাত্রীদের অসুবিধে না করেও। এর যন্ত্রপাতি এত ভাল যে খুব অল্প জায়গাতে গাড়ি ঘোরানো চলতে পারে।



ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরা সাধারণত মোটাই হয়। এত মোটা অবশ্য কিছুটা হয় তাদের পোশাকের গুণেও। প্রচুর জামা, কোট, মাফলার ইত্যাদি পরে বসে থাকে রাজার মতো। সাধারণত যাত্রীদের জিনিসপত্র নিয়ে সাহায্য তাদের করতে হয় না। তবে প্রয়োজন হলে তাও করতে রাজী—অবশ্য সেই সঙ্গে বকশিশের পরিমাণটাও বাড়বে বলে সে আশা করে। প্রত্যেক বারই ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরা বকশিশ পায়। সাধারণত ছ পেনি, কিন্তু দূরত্ব বেশি হলে বা জিনিসপত্র বেশি হলে বকশিশের পরিমাণটাও বেড়ে যায়।

ট্যাক্সি যারা চালায় তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার লণ্ডনের অগুনতি রাস্তার প্রতিটি মনে রাখে। কেবল তাই নয়, বিখ্যাত ক্লাব, হাসপাতাল, বিখ্যাত বাড়ি, রেস্তোরাঁ, পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাষ্ট্রদূতভবনগুলি, এ সমস্তই তাদের জানতে হয়। এদের পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয়—তবেই ওদের লাইসেন্স মেলে। বেশ কঠিন পরীক্ষা। তাই গর্ব এদের খুব বেশি। তারা লণ্ডনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত জানে। এদের আলাদা ভাষা আছে। এরা একজন আরোহী থাকলে বলে, Single Pin আর Roader মানে যে যাবে ছ' মাইলের বেশি। লণ্ডনের ট্যাক্সি ছ' মাইল পর্যন্ত যায় মীটারে, তারপর যেতে হলে একটু দরাদরি করতে হয়। এতে অসুবিধে এই যে, ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা এতে সব সময়ে জিতে যায়। পুরোনো ড্রাইভাররা নতুন ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের নাম দেয় Butter Boy। যারা বকশিশ দেয় না—এদের সংখ্যা নিতান্তই কম—তাদের বলে A Legal. ট্যাক্সির তুরকম জাত। সাধারণ এবং রেডিও ট্যাক্সি। সাধারণ ট্যাক্সি ধরা যায় ফোন করে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে। কিন্তু রেডিও ট্যাক্সি ফোন করা ছাড়া উপায় নেই। রেডিও ট্যাক্সির নানা পাড়ায় অফিস আছে,

সেখানে ফোন করে দিলেই তারা রেডিওতে তাদের ট্যাক্সিগুলিকে সংযোগ করে। এ উপায়ে ট্যাক্সি পেতে দেরি হতে পারে কিন্তু রাত দুটো তিনটেয় ট্যাক্সি পাবার এই একমাত্র ভাল উপায়।

আমরা যখন আমাদের হোটেলের পাঁচতলায় ঘর দু'খানিতে (একজনের জন্য একখানা ঘর) একটু গুছিয়ে বসলাম, তখন দেখলাম, ঘর দু'খানি পাশাপাশি এবং দুটি ঘরের মধ্যের দেয়ালে একটি দরজা আছে। হলদে রঙের দরজা—আর ক্রীম রঙের ওয়াল পেপার। একখানি খাট, পরিপাটি বিছানা। ঘরে একখানি মুখ ধোয়ার বেসিন—জল সব সময়ে পাওয়া যায়। দু'রকম জল—ঠাণ্ডা এবং গরম। ঠাণ্ডা জলের ব্যবহার হয় যখন কেউ জল খায়। ঘরগুলি খুব আলোকিত নয়। বাইরে আলো থাকলে তবে তো ঘরে আলো হবে। বই ইত্যাদি পড়তে ঘরে আলো জ্বালানোর প্রয়োজন। একটি ওয়ার্ডরোব রয়েছে ঘরের মধ্যে। এর মধ্যে তিনটি ভাগ—ওপরে টুপি এবং শার্ট রাখবার জায়গা, মাঝখানে জ্যাকেট, কোট এবং ট্রাউজারস রাখবার জায়গা এবং একেবারে তলায় জুতো এবং জুতো পালিসের সরঞ্জাম রাখবার জায়গা। মাথার কাছে একটি ছোট রেডিও। শুনলাম এই হোটেলের সাতশোরও বেশি ঘরের প্রত্যেকটিতে একটি করে রেডিও রয়েছে। রাত্রে শোয়া এবং ব্রেকফাস্ট-এর মূল্য সাড়ে আঠারো শিলিং। অন্য খাদ্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়।

জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ দেখবার পর যখন আমরা দেখলাম নতুনত্ব



কিছুই আর চোখে পড়ছে না—ট্র্যাফিক আলো বদলাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাস, মোটর গাড়ি থামছে আবার চলছে, তখন আমরা আস্তে আস্তে তলায় নেমে এলাম লিফ্‌টএ ক'রে। লিফটম্যানের চেহারায় কোনো বিশেষত্ব নেই। সাধারণ এবং বৃদ্ধ। পরে দেখেছি লণ্ডনের সমস্ত লিফটম্যানই সাধারণত বৃদ্ধ। এর কারণও আছে। একাজ করা অপেক্ষা-

কৃত সহজ এবং মাইনে কম। সহজে কোনো যুবক এ কাজ করতে চায় না। প্রায়ই লিফ্‌টচালকদের দেখা যায় তারা পঙ্গু। পঙ্গু লোকদের পক্ষে এরকম কাজ করা তত কঠিন নয়। যুদ্ধের সময় সৈন্য বাহিনীতে বা অসামরিক অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে পঙ্গু হয়েছিলেন তাঁদের এই ভাবে কাজে নিয়োগ করা হয়।

আমাদের দু'টি ঘরের জন্য দু'টি আলাদা চাবি। এ চাবির আকার প্রকাণ্ড। এত বড় চাবি যে তা দিয়ে অনায়াসে খণ্ড যুদ্ধ চালানো যেতে পারে। বড় চাবি করার উদ্দেশ্য হল এই যে, চাবিটি হোটেলের লোকেদের কাছে জমা দিয়ে যেতে হয়। ছোট চাবি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। হোটেলের বিশাল হলঘর। এই ঘরের এক পাশে একটা টেবিল, তার পেছনে হোটেলের কিছু সংখ্যক কর্মচারী ব্যস্ত। এদের কাজ হ'ল টেলিফোন কল এলে সেটি যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া, সেখানে লোক না থাকলে মেসেজ নেওয়া, চাবি জমা রাখা এবং দেওয়া, অধিবাসীদের অভিযোগ শোনা এবং তার প্রতিকার করা। এছাড়া এদের আরও কাজ হল চেহারা মনে রাখা। হোটেলে, বিশেষ করে বড় হোটেলে দৈনিক এত লোক আসে যে তাদের মধ্যে দু-একজন বদ চরিত্রের লোক থাকা আশ্চর্য নয়—এবং পুলিস প্রায়ই হোটেল-কর্মচারীদের শরণাপন্ন হয় কোনো লোককে খুঁজতে বেরিয়ে।



এই হল-ঘরের মাঝখানে একটা বিশাল টেবিল। টেবিলের এক কোণে গাদা ক'রে রাখা খবরের কাগজ—তিন জাতের। ঈভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড, ঈভনিং নিউজ এবং স্টার। তিনটেই 'সান্ধ্য' কাগজ বটে, কিন্তু বেলা সাড়ে দশটায় তাদের প্রথম সংস্কারণ ছাপা হয়। সমস্ত দিন চার-পাঁচবার সংস্করণ বদলানো হয়। সমস্ত সংস্করণে সমস্ত খবর পাওয়া যায় না। তাই বেলা সাড়ে দশটার খবরে হয়তো দেখা গেল কোনো একটি বাড়িতে

আগুন জ্বলছে, তার সংবাদ। বেলা চারটের সময় যে কাগজ বেরুলো তাতে দেখা গেল, আগুন নিবে গেছে তার সংবাদ। রাত আটটার সময় সেটি খবরই নয়, পুরোনো ইতিহাস। এখানে সান্ধ্য কাগজগুলি কম বিক্রি হয় না। তিনটি কাগজ মিলে বাইশ লক্ষ কাগজ দৈনিক বিক্রি। এ তো কেবল সান্ধ্য কাগজ—সকালের কাগজগুলির বিক্রির পরিমাণ প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। দু তিনটি খবরের কাগজের বিক্রি চল্লিশ লক্ষের বেশি। হিসাবটা এক দিনের। নিউজ অব দি ওয়ালর্ড নামে একটি খবরের কাগজ আছে, এটি বেরোয় প্রত্যেক রবিবারে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় এই কাগজ—প্রায় আশী লক্ষ। এ কাগজে আদালত কাহিনীর প্রাধান্য। লোকদের হাতে সর্বদা খবরের কাগজ দেখা যায়। খুব সকালে টিউবে চড়লে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি লোক খবরের কাগজে মুখ গুঁজে বসে আছে। বাসে রেস্তোরাঁয় পার্কে সর্বত্র খবরের কাগজ। লণ্ডন খবরের কাগজের শহর বলতে কারুর আপত্তি থাকা উচিত নয়। এই হাজার হাজার মন খবরের কাগজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনের এবং ইংল্যাণ্ডের লোকেরা পড়ে ফেলে। তারপর বেশ কিছু বাসে টিউবে রেস্তোরাঁয় ফেলে যায়। অনেকেই বাসে বা টিউবের পরিত্যক্ত খবরের কাগজ পড়ে, নিজেরা কেনে না। কিন্তু এতে বিপদ আছে—রোজ একই রকম কাগজ পাবার উপায় নেই। আজ টেলিগ্রাফ, কাল স্কেচ, পরশু হয়ত মিরর। আমাদের এক বন্ধু পয়সা বাঁচানোর জন্য এইভাবে খবরের কাগজ সংগ্রহ করতেন। তার নানারকম মতামত শোনা যেত। কোন একটি ঘটনা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মতের মত নানা কাগজের নানা মত। মালয়ের লোকদের মুণ্ডু কেটে ফেলা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে সবাই একমত নয়। নরম থেকে চরম এইরকম প্রায় দশ বারোটি মত পাওয়া যাবে এ সম্পর্কে। ডেলি ওয়ার্কার থেকে শুরু করে টাইমস্-এ পর্যন্ত মতামতের খেলা প্রতিদিন সকালে দেখা যেতে পারে দশটি কাগজ সাজিয়ে। টাইমসের গাম্ভীর্য সবচেয়ে বেশি। সাত চড়েও রা না করা তাঁদের স্বভাব। সরকারী ভাবে কোন খবর এলে তবেই তা সত্য—না

এলে সে সম্পর্কে টাইমস্ নীরব। ধরা যাক টাইমসের সম্পাদক নিজে দেখে এসেছেন অ্যান্টনি ইডেন প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিচ্ছেন, কিন্তু টাইমসে সে সম্পর্কে একটি কথা থাকবে না। ঘুণাক্ষরেও লেখা থাকবে না, "শোনা যাচ্ছে যে অ্যান্টনি ইডেন পদত্যাগ করছেন···।" কিন্তু ডেলি ওয়ার্কার বড় হেড লাইন ছাপাবে, "ইডেন অবশেষে পদত্যাগ করবার জন্য ব্যগ্র!" ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন লিখবে, "অ্যান্টনি ইডেনের শরীরটা সুস্থ যাচ্ছে না—নানা কারণে মন্ত্রিত্ব রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। হয়ত শীগ্গিরই তিনি পদত্যাগ করবেন।"

আমাদের বন্ধুটিকে যে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন করে তার উত্তর থেকে আমরা বুঝতে পারতাম সে কোন্ কাগজখানা টিউব বা বাস থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। সে রোজ নানারকম মত শুনত আর অবাক হত। একদিন সে প্রমাণ পেত বিভানের মত লোক পৃথিবীতে হয় না, পরদিনই শুনত বিভানের চরিত্র শুয়োরেরও অধম। এই ছেলেটির পরে মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রতি বছর ভারতীয়দের মধ্যে দু একজনের মাথা খারাপ হয় লণ্ডনে, কিন্তু বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়ার ফলে হয় কি না তা এখনও গবেষণা করা হয় নি। ভবিষ্যতে যদি কেউ গবেষণা করেন তাহলে আশা করি তিনি দেখবেন বিভিন্নরকম খবরের কাগজ পড়ার ফলেও মাথা খারাপ হতে পারে কি না।

এই খবরের কাগজের হেডলাইন আমাদের চোখে পড়লো 'রাসেল স্কোয়ার অঞ্চলে নরহত্যা'। সঙ্গে সঙ্গে একটি কাগজ আমরা কিনে ফেললাম। দেড় পেনি—(বা ছ'পয়সা) দাম। কিনে সেটাকে তৎক্ষণাৎ পড়ে ফেলা গেল। একটি লোক সত্যিই খুন হয়েছে রাসেল স্কয়ার অঞ্চলে। অর্থাৎ যে অঞ্চলে আমরা ছিলাম। একটুও ভীত হলাম না সেকথা জোর করে বলা চলে না। সেও একটি হোটেলে থাকতো। দৈনিক ভাড়া দিত সাড়ে সাত শিলিং। লোকটি ভাগ্যবান ছিল সন্দেহ নেই—সাড়ে সাত শিলিং দৈনিক ভাড়ায় রাসেল স্কয়ার অঞ্চলে সে হোটেল পেয়েছিল—এটাই তার প্রমাণ। হোটেলের ঠিকানা দেওয়া ছিল না—

নতুবা সে হোটেলের সামনে ঘরটাকে ভাড়া নেবার জন্য জনতা দাঁড়িয়ে যেত। পুলক একবার বলেওছিল যে ঐ হোটেলে থাকতে পারলে সস্তায় থাকা যেত।

হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম কুয়াসা একটু বেড়েছে। লণ্ডনের বহুকালের সঙ্গী এই কুয়াসা। লণ্ডনের সঙ্গে কুয়াসার অদ্ভুত একটা সম্পর্ক হয়তো বিনা কারণেই আছে। কুয়াসা প্যারিসেও হয় এবং বেশ প্রবল কুয়াসাই হ'য়ে থাকে। বন বা বার্লিনেও প্রচুর কুয়াসার সংবাদ চোখে পড়ে, কিন্তু লণ্ডনের সঙ্গে তার সাহিত্যিক বা আত্মিক সম্পর্ক। হয়ত এজন্য চার্লস ডিকেন্স কিছুটা দায়ী, হয়ত দায়ী টার্নারের চোখ এবং তুলি। এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে—লণ্ডন থেকে কুয়াসা সরিয়ে নিলে লণ্ডন আর লণ্ডন থাকবে না। কুয়াসার মধ্যে বেরুলাম আমরা খাদ্যের সন্ধানে—বেলা তখন তিনটে। এতক্ষণ খাওয়া হয়নি।

খানিকক্ষণ হেঁটে হোটেল খুঁজতেই বেশ গরম হ'য়ে গেলাম। রয়্যাল হোটেলেই অবশ্য খেয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু যা দাম দেখলাম তাতে সেখানে খাওয়া উচিত হবে না ব'লে মনে হল। লাঞ্চের দাম প্রায় সাত শিলিং। পুলক বললো, "আমাদের সমস্যা হ'ল একটা সস্তা এবং ভদ্র রেস্তোরাঁ খুঁজে বার করা।" পরে দেখেছি সমস্ত লণ্ডনের লোকেরই সেই এক সমস্যা। সবাই সস্তা এবং ভদ্র রেস্তোরাঁ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। সস্তা এবং ভদ্র রেস্তোরাঁর খোঁজে আমরা বেরুলাম। বোধ হয় কিংসওয়েতে পেয়ে গেলাম একটা দোকান। সেখানে দাঁড়িয়ে খাবারের দাম দেখছি। হিসেব করে দেখলাম শিলিং চারেক খরচ হবে।

প্রায় ঢুকবো সে দোকানে, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে বললেন, এখানে খেতে যাচ্ছ?

আমরা বললাম, হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন, যদি খেতেই চাও, তাহ'লে আর এখানে ঢুকো না। আমি কাল এখানে খেয়েছি কিন্তু এইটুকু

খেতে দেয়। ব'লে নিজের তিনটে আঙুলের ডগা একত্র করে পরিমাণ দেখালেন। সে রেস্তোরাঁয় আর আমরা কখনো ঢুকিনি। ভদ্রলোক সত্যি কথা বলেছিলেন কি মিথ্যে কথা বলেছিলেন তা অজ্ঞাতই রয়ে গেল।



পুলক বললো, স্যাণ্ডউইচ খাবে সে এবং আমাকেও খেতে হবে, কারণ সস্তায় হবে। স্যাণ্ডউইচের দোকান অতএব খুঁজতে আরম্ভ করলাম। প্রথমে গাওয়ার স্ট্রীট, ম্যালেট স্ট্রীট, গর্ডন স্কয়ার, মিউজিয়াম স্ট্রীট ইত্যাদি জায়গায় খুঁজলাম; পেলাম না। এইসময় স্থির করলাম কাউকে জিজ্ঞেস করা যাক। জিজ্ঞেস করেই বুঝলাম আমরা বহুদিন ইংরিজি পড়েছি বটে কিন্তু উচ্চারণ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান হয়নি। ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ খানিক সময় নিলেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে। তারপর তিনি যখন শুরু করলেন তাঁর কথাবার্তা, তাতে এইটুকু বোঝা গেল যে তিনি বলছেন, স্যাণ্ডউইচ লণ্ডনের সর্বত্র পাওয়া যায়—যে কোন দিকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই স্যাণ্ডউইচের দোকান। আমরা যখন বললাম, মিনিট পনরো হেঁটেও কোথাও স্যাণ্ডউইচের দোকান পাইনি, তখন তিনি বললেন যে, সে সব কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বলে হনহন করে চলে গেলেন।

খানিক পরে আমরা ঘুরতে ঘুরতে রাসেল স্কয়ার টিউব স্টেশনে এসে পৌঁছে গেলাম। এই আমাদের প্রথম একটি টিউব স্টেশন দেখা। বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। টিউব স্টেশনের সামনে একজন জুতো পালিশওয়ালা ব'সে আছে। (একজোড়া জুতো পালিশ করতে নেয় ছ' পেনি।) সমস্ত লণ্ডনে সবসমেত বোধ হয় জন-চারেক জুতো পালিশওয়ালা দেখেছি। লণ্ডনবাসী প্রায় সকলেই নিজে-দের জুতো নিজেরাই পালিশ ক'রে থাকে।

টিউব স্টেশনকে বাইরে থেকে মনে হয় যেন একটি কিছুর দোকান।

এটা যে রেলোয়ে স্টেশন, লিফটে করে নিচে নেমে যে অন্য জগতে প্রবেশ করা যায়, যে জগতে আছে কেবল গতি আর স্টেশন তা আর বোঝা যায় না। টিউবে ভ্রমণ মানে বাইরের কোনো দৃশ্য দেখা নয়। মাটির তলার সুড়ঙ্গের চেহারা সর্বত্রই এক। মাটির দেওয়াল এত কাছে থাকে যে তা দেওয়াল হিসেবে নজরে পড়ে না। টিউব থেকে বাইরে কেউ তাকায় না। এ তো গেল শহরের টিউব। শহর থেকে বেরুলেই সুড়ঙ্গ ছেড়ে ট্রেনেরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ে। তখন আশ্চর্য মনে হয়।

টিউবের পাশেই স্ন্যাকবার। দোকানটি তকতকে, ঝকঝকে। চারিদিকে ঘষা মাজা পরিষ্কার। নিয়ন লাইট দিনের বেলাতেও জ্বলছে।

এই দোকানটি বেশ ভাল বলে মনে হল। কিন্তু আমাদের কাছে যেটা ভাল বলে মনে হল ইংরেজদের কাছে সেটাই খারাপ—চিপ এবং ভালগার। ইংরেজদের ভাল রেস্তোরাঁয় আলো মৃদু—এবং দোকান তকতকে ঝকঝকে ত নয়ই। পরিষ্কার কিন্তু উজ্জ্বল নয়। কিন্তু এই স্ন্যাকবারগুলি নেহাত প্রয়োজনীয় জিনিস—কিন্তু পৃথিবীর কোন জাতই এখানে আরাম করে খেতে যায় না। এই হ'ল আমাদের সস্তা স্যাণ্ডউইচের দোকান। পুলক হিসেব করছে ক'খানা স্যাণ্ডউইচ খাওয়া যায়। কোলকাতার কফী হাউসের স্যাণ্ডউইচ তো খানছয়েক খেয়েও পেট ভ'রত না—যাই হোক এক একজন ছ'খানা করে নিয়ে প্রথমে দেখা যাক। পুলক কথাবার্তা বলায় ওস্তাদ। সে গিয়ে বারোখানা স্যাণ্ডউইচ চাইল দুটি প্লেটে। দুখানি প্লেটে করে ও যখন বারোখানা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এলো তখন আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। বিশাল চেহারার রুটি দিয়ে সে স্যাণ্ডউইচগুলি তৈরি। কোলকাতায় আমরা যে রকম স্যাণ্ডউইচ খেতাম এর এক একখানার আকার তার আট গুণ।

এ অবস্থায় আমি কেন, আমাদের আশে-পাশে বিস্তর লোক ছিল



তারা আমাদের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালো। এমন বিস্ময় তাদের চোখে এর পর আর দেখিনি। ইংরেজেরা শুনেছিলাম অন্য কারুর কোনো ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয় না। কথাটা সত্যি নয়। তারা সাধারণত কোনো ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করে না। কিন্তু আমাদের স্যাণ্ডউইচের ব্যাপারটা কি সাধারণ ছিল? আপ রুচি খানা, সে হল গিয়ে খাদ্যের প্রকারের কথা, পরিমাণের কথা নয়। খাদ্যের পরিমাণ গ্রেট বৃটেনে রেলের লাইনের মতোই মাপ জোক করা, একটু কম বা বেশি করবার উপায় নেই। রোগা, বেঁটে, লম্বা এরা প্রত্যেকেই একই পরিমাণ খাবার খায়। সাধারণত দুপুরে যারা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে জীবনযাত্রা চালায়—(দায়ে পড়ে নয়, অনেকে শখ ক'রেও স্যাণ্ডউইচ খেয়ে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর বিস্বাদতম যদি কোনো স্যাণ্ডউইচ থেকে থাকে তো সে হ'ল বৃটিশ স্যাণ্ডউইচ।)

পুলক আমার কাছে এসে বললো "লোকগুলো কেমন তাকাচ্ছে।"

আমি বললাম, "তাকাবে না? এত স্যাণ্ডউইচ আমরা খাব কেমন করে?"

পুলক বললো, "খেতেই হবে।"

আমি হিসেব করে দেখলাম, একখানা, বড় জোর দেড়খানা ঐ বাঘা স্যাণ্ডউইচ খেতে পারবো। বললাম তাই পুলককে।

পুলক বললো, "চেষ্টা করা যাক, কিন্তু এই শুকনো জিনিস খেতে কয়েক গ্লাস জলের প্রয়োজন।"

পুলক এক গ্লাস ক'রে জল আর দু' কাপ ক'রে চা এনে বসলো কুম্ভকর্ণের জলযোগপর্ব শেষ করতে। পুলক সওয়া দুই এবং আমি দেড়খানা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে কোনো রকমে বেরিয়ে বেঁচেছিলাম।

বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যাণ্ডউইচ কিনতে কত খরচ পড়ল।"

পুলক বললো, "চার কাপ চা আর বারোটা স্যাণ্ডউইচে খরচ পড়েছে ষোলো শিলিং।" রয়্যাল হোটেলের লাঞ্চ খাইনি ভেবে কষ্ট হল।

একটু এদিক-ওদিক ঘুরে পুলক বললো, "একবার টিউবে চড়া যাক্।"

শখ আমারও। বললাম, "যাই কোথায় ?"

পুলক বললো, "কোথাও চল, যে কোনো জায়গায়।"

কিন্তু আগে টিকেট কিনতে হয়, হুট করে বললেই তো হয় না যে, যে-কোনো জায়গার টিকিট একখানা দাও—অতএব আমরা একটি ম্যাপ দেখে বার করলাম কোথায় যাব। বণ্ড স্ট্রীটের নাম আগে শোনা ছিল, পিকাডিলির নামও শোনা ছিল কিন্তু মনে হ'ল বণ্ড স্ট্রীটটা বেশি ভাল হবে।

আমরা দু'খানা বণ্ড স্ট্রীটের টিকিট চাইলাম। দু'খানা তিন পেনি দামের টিকিট পেয়ে গেলাম। সেই টিকিট নিয়ে দেখলাম তাতে বণ্ড স্ট্রীটের নাম কোথাও লেখেনি, কেবল রাসেল স্কয়ারের নাম লেখা আছে আর দাম লেখা আছে। টিকিটটি নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম। নিচে যাবার সিঁড়িও খুঁজে পেলাম। সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের কে যেন বললো লিফটে করে যেতে। দেখি পাশেই বিশাল একটা লিফট্ আছে, যাকে প্রথমে মনে করেছিলাম একটা মাঝারি গোছের ঘর। সেই ঘরটাই নামতে আরম্ভ করলো। আস্তে



আস্তে নেমে এক জায়গায় থামলো। আমরা বেরুলাম, এক জায়গায় লেখা আছে 'টু দি ট্রেনস্' সঙ্গে তীর এঁকে দেখানো। আমরা ট্রেনের দিকে ছুটলাম। দুটি প্ল্যাটফরম দুদিকে যাবার—একটি প্ল্যাটফরমের দেওয়ালে লেখা বণ্ড স্ট্রীট্ এবং অন্যান্য স্টেশনের নাম, যেমন হোবর্ন, কভেণ্ট গার্ডেন, পিকাডিলি ইত্যাদি।

আমরা ম্যাপে দেখেছিলাম একবার বদল করতে হবে ট্রেন। বদল করতে হবে হোবর্নে। আমরা হোবর্নে নেমেই দেখতে পেলাম লেখা আছে সেন্ট্রাল লাইন পেতে হ'লে ঐ দিকে যান ব'লে তীর এঁকে দেখানো আছে। সেন্ট্রাল লাইনে আছে বণ্ড স্ট্রীট। রাসেল স্কয়ার ছিল পিকাডিলি লাইনে। লণ্ডনের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছ'রকম লাইন আছে, ছ'রকম লাইনের ছ'রকম রঙ। ম্যাপে রঙ দেখেই বোঝা যায় কোন লাইন। টিউবের টিকিট কেনা থেকে গাড়ি ধরা পর্যন্ত, এবং গন্তব্য-স্থানে পৌঁছে টিউব থেকে বেরোনো পর্যন্ত লোকেরা বিরাট চঞ্চল হয়ে ওঠে। টিউবে কেউ আস্তে হাঁটে না। সমস্ত সময় লোকেরা কেবল ছুটোছুটিই করছে। লণ্ডনের উপরের চাইতে তলাকার গতি অনেক বেশি।

আমরা বণ্ড স্ট্রীটে গিয়ে উপস্থিত তো হ'লাম। উঠে দেখি বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে আমরা পড়ে গিয়েছি। প্রথম যেটা আমাদের আকর্ষণ করলো তা হ'ল এই এতগুলি লোকের যাতায়াত, কোনোরকম গোল-মাল নেই। বহুদিন আগে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে অবাক হ'য়েছিলেন। বৃটিশ লোকদের শান্তিপ্রিয়তা আধুনিক নয়। অবশ্য তুলনায় আগে অনেক বেশি গোলমাল করতো তারা। সভ্যতার এই হ'চ্ছে আর একটি মাপকাঠি। যে জাতি যত নীরব তারা তত শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব কাম্য কি না সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা। এই নীরবতার সঙ্গে সভ্যতার কতখানি সম্পর্ক আর কতখানি ঠাণ্ডা জলবায়ুর তা আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয় যত কম লোকের সঙ্গে পরিচয় থাকে, তত কম আমরা কথা বলি। এই হিসাবে বৃটিশ লোকদের নীরবতার একটি কারণ হয়তো বার করা যায়। তবে বণ্ড স্ট্রীট হ'ল দোকান এবং অফিস পাড়া। এখানে স্বভাবতই পরিচিত লোক পাওয়া শক্ত।

তখন হয়তো পাঁচটা বাজে। অফিস ছুটি হ'চ্ছে—(আদালত অন্য পাড়ায়)। দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ হ'চ্ছে, হয়েছে বা হবে। এই ব্যাপারটা আমাদের আরো আশ্চর্য লেগেছিল। কোলকাতায় রাত নটা

দশটার সময় হঠাৎ গেঞ্জি কিনে আনা যায়, কিন্তু লণ্ডনে ওষুধের দোকানগুলি পর্যন্ত সাড়ে পাঁচটা ছটায় বন্ধ হ'য়ে যায়। দু'একটি দোকান অবশ্য সমস্ত লণ্ডনে সারারাত খুলে রাখে, ওষুধ বেচবার জন্য। সন্ধ্যের পর লণ্ডন হঠাৎ ভয়ানক রকম নির্জন হ'য়ে পড়ে। সন্ধ্যে সাতটায় কোন কোন রাস্তা দেখে তো মনে হয় রাত দুপুর হয়ে গিয়েছে।

বণ্ড স্ট্রীট এবং রাসেল স্কয়ার, দূরত্বে মাইল খানেক মাত্র। এর মধ্যে কিন্তু চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত। বণ্ড স্ট্রীট ফ্যাশনের রাজ্য, এখানে লণ্ডনের সবচেয়ে দামি ফার কোট, দামি জুতো পাওয়া যায়।

আর রাসেল স্কয়ার অঞ্চল হোটেল এবং বিদ্যার সমন্বয়। এই রাসেল স্কয়ারে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি, ব্লুমসবেরি অঞ্চল, যেখানে সাহিত্যিক-উন্নাসিকতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে বিরাট কায়দায় হোটেলের ব্যবসা। এখানে এত হোটেল আছে যে তাদের নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। এত বেশি ঘর কোনো কোনো হোটেলে যে তার হিসেব দেখলে চমকাতে হয়। আমরা পৃথিবীর বহু জিনিস দেখেই চমকাচ্ছি বেশ কয়েকশো বছর। আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যও চমকানো বলেই মনে হয়। আমাদের রয়্যাল হোটেলে ঘরের সংখ্যা ছিল সাতশোর কাছাকাছি। লণ্ডনে এত বেশি বাইরের লোক আসে এবং নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকে যে হোটেলের ব্যবসা কখনো মন্দা হয় না। আমাদের দেশে বিদেশ থেকে কেউ কেউ এলেও তাদের জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করি না। এবং সেই কারণেই হয়ত তারা আমাদের দেশে আসতে চায় না। যেগুলো চালু হোটেল আছে সে সব হোটেলের ভাড়া দেবার সাধ্য বিদেশীদেরও কমই আছে। হোটেলের ব্যবসায়ে লাভও অনেক বেশি হয়। রাসেল স্কয়ার অঞ্চলে আছে গীল্ডফোর্ড স্ট্রীট, এখানে আছে একটি ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেল, সাধারণত ভারতীয়রা এখানে বেশি দিন থাকে না। আর আছে রাসেল স্কয়ার থেকে খুব দূরে নয় ওয়াই. এম. সি. এ.—

ফিটজরয় স্কয়ারে। সম্প্রতি তৈরি এই বাড়িটি ভারতীয় ছাত্রদের অনেক সুবিধে করে দিয়েছে! এ সমস্তই মধ্য লণ্ডনে! লণ্ডন এত বড় জায়গা যে এর ঠিক মাঝখানটি খুঁজে পাওয়া শক্ত। আগে যে জায়গাটি লণ্ডনের পশ্চিম ছিল, এখন সেটাই মধ্য লণ্ডনের একটি অংশ। পশ্চিম লণ্ডন দূরে চলে গিয়েছে অ্যাকটন ছাড়িয়ে হাউনস্লোর পথে। পূর্ব লণ্ডন ঈস্ট এণ্ডেই সমাপ্ত নয়। অবশ্য ঈস্ট এণ্ড নামটা আর বদলায়নি, যেমন বদলায়নি ওয়েস্ট এণ্ড নাম। লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে ফ্যাশনের—বণ্ড স্ট্রীট।

লণ্ডন আদ্যিকালের শহর। এ শহরে এত জাতের লোক থাকে যে পৃথিবীর সমস্ত জাতের লোককে দেখবার জন্য পৃথিবী আর ঘুরবার প্রয়োজন নেই। এখানে প্রচুর ফরাসী, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, জার্মান থাকে। এখানে থাকে চীনারা, এখানে থাকে হাজার হাজার ভারতীয়, পোলিশ, রাশিয়ান, গ্রীক, সাইপ্রাসের লোক; এখানে থাকে ঈজিপ্টের, টিউনিসিয়ার লোক। তা ছাড়া থাকে নানা জাতের কালো লোক।

এরকম শহর আর নেই। কেউ কেউ প্যারিসের নাম করে, কিন্তু প্যারিসের বৈশিষ্ট্য—প্যারিসের ল্যুভর, আইফেল টাওয়ার, সীন নদীর সৌন্দর্য, নোতর দাম ইত্যাদিতে তাকে ছবির মতো দেখায়। লণ্ডনের অমন সৌন্দর্য নেই, কিন্তু সমস্ত সুবিধে আছে। লণ্ডনের লোক কোনো বিদেশীর দিকে অবাক হ'য়ে তাকায় না। লণ্ডন রাজা, রানী, রাজকুমারী, প্রিন্স চার্লস, রাজকুমারীর বান্ধবীর ঝি, বাকিংহ্যাম প্যালেসের ঘোড়া ইত্যাদি মহাপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই উৎসাহ বোধ করে না। তাই ব'লে লণ্ডন মৃতনগরী নয়। লণ্ডনের বিশালত্ব এর জন্য দায়ী। এ এতই বড় যে এক ভূমিকম্প ছাড়া কোনো জিনিস লণ্ডনের সর্বত্র একসঙ্গে ঘটে না কখনো। ভূমিকম্পও প্রায় ঘটে না। প্যারিস 'বাস্তিল দিবসে' ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লণ্ডন 'গাই ফক্স ডে'-তেও নিতান্তই শান্ত। কয়েকটি জায়গায়

বাজি পোড়ানো হয় মাত্র। লণ্ডনের শোক নেই, উৎসব নেই। এ যেন একটা সমুদ্র। ছোটো পুকুরেই মাছের লাফ বলবার মতো—সমুদ্রে জাহাজ-ডুবিও একটা সামান্য ঘটনা। এখানে সমস্তই আছে সমুদ্রের বিশালত্ব নিয়ে। সমুদ্রের মতই রকমারি এর কাণ্ডকারখানা।

তিন চার দিন লণ্ডনে থেকে পুলক বসু চ'লে গেল স্কটল্যাণ্ড।

বন্ধুহীন হয়ে আমি চলে এলাম ব্লেমিন ক্রেসেণ্টে। পাড়াটা নটিং হিল গেট থেকে কয়েক মিনিট। নটিং হিল গেট পাড়াটা একটু মিশ্রিত পাড়া। নানা ধরনের মিশ্রণ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত গরিব পাড়া এবং বড়লোক পাড়া এই একই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া আছে সমস্যা-জর্জরিত কালো এবং বাদামী লোকেদের বাস। প্রতি মাসে এদের সংখ্যা বাড়ছে এই অঞ্চলে এবং আরো কয়েকটি অঞ্চলে। এরা আসে তাদের দেশ থেকে সাধারণত কাজ করতে।

আমি যে ধরনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম সেগুলোকে ইংরিজিতে বলে digs। কিন্তু কথাটা এল কোথা থেকে? কথাটা এখনো সব অভিধানে ঢোকেনি কেন? —একজন বিশেষজ্ঞ বললেন, যুদ্ধের সময় কামান গোলা পড়ে যে গর্ত হত তাতে ঢুকে পড়লে মরবার ভয় কম ছিল—ওগুলোকে চলতি ভাষায় বলা হত ডিগ্‌স, পরে বাড়ি খোঁজার সঙ্গে ঐ কথাটির যোগাযোগ ঘটে গিয়ে অন্য অর্থে দাঁড়িয়েছে। কেবল কামানের গোলার গর্ত নয়, ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আশ্রয় নেওয়া থেকেই কথাটা এসেছে। লণ্ডনে অবশ্য ঘর খুঁজতে কেউ ট্রেঞ্চ খোঁড়ে না, তবে এজন্য মাথা খুঁড়তে অবশ্যই হয়। পাড়ায় পাড়ায় ঢুঁ মেরে বেড়াতে হয়, যতক্ষণ না সন্ধান মেলে, অনেকটা 'গেছো বাবা'র সন্ধান করার মত ব্যাপারটা আর কি। তবে ভারতীয় ছাত্ররা-যে কোন পাড়ায় যেতে চায় না। কেনসিংটন, বেজওয়াটার, সুইস কটেজ, হ্যাম্পস্টেড, ফিনস্‌বেরি পার্ক ইত্যাদি পাড়া পেলেই ভাল। মে ফেয়ার ওয়েস্ট মিনস্টার-এ অবশ্য যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না। সেখানে খরচ যেমন বেশি, তেমনি বাড়িওলারা খুব খুঁতখুঁতে হয়।

তারা ভাড়াটের রং-এর তোয়াক্কা করে না, কিন্তু আশা করে পণ্ডিত নেহ্‌রু বা উইনস্টন চার্চিলের সার্টিফিকেট নিয়ে যাবে গৃহ সন্ধানকারী।

মনের মতো ঘর পেতে অনেক সময় তিন চার মাসের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এই কথাটার মধ্যে কিছু ভুল বুঝবার অবশ্য সম্ভাবনা আছে—ঘর পাওয়া সমস্যা বটে, কিন্তু সে হল কম ভাড়ার ঘর, বেশি ভাড়া দিতে পারলে ঘর প্রচুর মেলে। আমাদের মতো বাদামী লোকেদের এবং আফ্রিকার কালো লোকদের পক্ষে ঘর পাওয়া একটু বেশি শক্ত। আজকাল লণ্ডনে প্রচুর বাড়ি তৈরি হচ্ছে ও যেমন তেমনি বিদেশীরাও বেশ কিছু বাড়ি কিনছে। বিশেষ করে আফ্রিকানদের বেশ কিছু বাড়ি আছে। অন্যত্র বাড়ি না পেয়ে আফ্রিকানরা সেখানে অনেক বেশি দাম দিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। ভারতীয়দেরও প্রচুর বাড়ি আছে এবং ভাড়াও দেয় তারা তবে ভারতীয় বাড়িওয়ালা আফ্রিকানদের কমই বাড়ি ভাড়া দেয়। সাদা চামড়ার ভাড়াটে পেলে অধিকাংশ বিলিতি ল্যাণ্ডলেডির মত ভারতীয় বাড়িওয়ালারাও খুশি হয়। বিশেষ করে বাড়ি যদি ভাল হয় তাহলে চট করে অজানা কোন ভারতীয়কে দেওয়া হয় না।

লণ্ডনের সঙ্গে কোলকাতার কোনো তুলনাই হয় না। লণ্ডনে যাকে ওরা বলে ভয়ানক ঘিঞ্জি অঞ্চল, সে অঞ্চল কোলকাতার প্রায় যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় দশ গুণ ভালো। লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় পার্কের ছড়াছড়ি। একটি ম্যাপ নিলেই দেখা যায় সবুজে ভর্তি লণ্ডন। গোল্ডার্স গ্রীন থেকে আরম্ভ করে হার্ন হিল পর্যন্ত অগুনতি পার্ক লণ্ডনের শহর জীবনকে এনে দেয় অপূর্ব প্রশান্তি। কেবল হাইড পার্ক আর কেনসিংটন গার্ডনস নয়, শহরের মধ্যে আছে আরো গ্রীন পার্ক, এই পার্কে কোনো ফুলের গাছ নেই। পূরো সবুজ পার্ক এটি। সেণ্ট জেমস পার্ক, অপূর্ব সুন্দর এই পার্কটিতে আছে নানা জাতের হাঁস। বার্কলি স্কয়ার, এর পাশে রয়েছে আমাদের দেশের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রবার্ট ক্লাইবের বাড়ি। লোকে বলে নাইটিংগেল পাখির গান

শোনা যায় এই পার্কে। আর পাখি ভর্তি রীজেণ্টস পার্ক, প্রিমরোজ হিল ইত্যাদি। পার্কে বসে, শুয়ে, কত লোককে দেখা যায়। ইংরেজরা পার্ক খুব পছন্দ করে। বিশাল পার্কের মধ্যে আরো অনেক আছে—যেমন রিচমণ্ড পার্ক, উইম্বলডন পার্ক এবং কিউ গার্ডনস। পার্ক মানুষকে যদিও স্বস্তি দেয় কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন তাঁর নিজের ছেলে-বেলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, পার্ক তাঁকে সবচেয়ে বিষণ্ণ করে তুলতো। পার্কের হাসি-খেলার মধ্যে তিনি নিজেকে মনে করতেন আরো বেশি নিঃসঙ্গ। চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম হয় লণ্ডনের দরিদ্রতম পাড়ার অন্যতম কেনিংটনএ। এ পাড়াটি অবশ্য এখন অনেকটা চলনসই হয়েছে, যদিও যুদ্ধের সময়কার বাইশ হাজার টন বোমার কতকগুলির দাগ এখনো মেলায়নি।

নানুদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল লণ্ডনে নেমেই। তিনি আমাদের লণ্ডন সম্পর্কে খানিকটা বক্তৃতা দিয়ে নিয়েছিলেন। কি ভাবে খরচ কমাতে হয় তার একটা সহজ ফিরিস্তি। তিনিই বলেছিলেন, মিসেস ম্যাথার্সের বাড়িতে গিয়ে একবার টোকা মেরে দেখতে। আর যদি সেখানে না হয় তাহলে কোলভিল টেরাসে গিয়ে মিসেস উডের কাছে যেতে। ঘর খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমি আর পুলক। ঘর অবশ্য আমার জন্য, পুলক কেবল সঙ্গে এসেছিল—যদিও দুজনেই ঘর খোঁজার ব্যাপারে নেহাতই গেঁয়ো—বিশেষত লণ্ডনে। তবে ভরসা ছিল যে বাড়িটা সম্পর্কে নানুদার বাক্য, 'যাও দেখবে মোটামুটি খুব খারাপ নয়—খেতে দেয় অনেক।' আর পাড়াটা? নানুদা বলেছিলেন, 'পাড়াটা মন্দ নয়', তারপর একটু থেমে যোগ করেছিলেন, 'না খুব খারাপ নয়।' নানুদার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যদি আরো জিজ্ঞেস করি তিনি বলেই দেবেন, জঘন্য পাড়া। কিন্তু ভরসা হ'ল না অন্য কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে। আমি আর পুলক একদিন সন্ধ্যের ব্লেনিমক্রেসেণ্টে এসে উপস্থিত হলাম।

প্রথমে বাড়িটাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম বাইরে থেকে। কিন্তু বাইরে থেকে লণ্ডনের কোনো বাড়ি বোঝা য়ায় না যে সেটা ভেতরে কেমন। অতএব গিয়ে কড়া নাড়লাম। দরজা তৎক্ষণাৎ খুলে গেল। একজন মোটা ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিয়ে বললেন—কি চাই? আমরা ঘর আছে কিনা জানতে চাইলাম। কি আশ্চর্য! ঘর আছে। —কেন কষ্ট করে এলে, টেলিফোন করলেই তো পারতে, মিসেস ম্যাথার্স তাঁর ছোট ছোট চোখ দিয়ে আমাদের দেখতে দেখতে এবং হাসতে হাসতে বললেন। লক্ষ্য করলাম এক টুকরো কাটা শশা লেগে আছে তাঁর জামার উপর কাঁধের কাছে। শশা কাটতে কাটতে এক ফাঁকে কখন লেগে গেছে। পুলক বললো, টেলিফোন করলে তো ঘরটা দেখা যেত না, আমরা ঘরটাকে দেখতে চাই। এ কথায় মিসেস ম্যাথার্স বললেন, জর্জ! জর্জ! এরপরেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো কাণ্ড! পাশ থেকে বিশাল চেহারার লাল টুকটুকে এক বুড়ো নোংরা একটা পাইপ মুখে আবির্ভূত হলেন।—ওদের নিয়ে ঘরটা দেখাও—হ্যাঁ, ওপরের ঘরটি। বুড়োটি অস্ফুট স্বরে কি যেন বললেন, সে ভাষাটা সবাই বিরক্ত হ'লে ব্যবহার করে। কোনো কথা নয় কেবল এক জাতের আওয়াজ।

ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে ওপরে চললেন। সিঁড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে উঠলো। সিঁড়ির আলোগুলি এত ক্ষীণ যে ওর চাইতে সামান্য কম আলো হ'লে দেখতে পাওয়া অসম্ভব হ'ত। কাঠের সিঁড়ির উপর পাটের কার্পেট তাও শতছিদ্র আর বিবর্ণ। দেয়ালের কাগজ কতদিন আগে বদলানো হয়েছিল তা সপ্তম এডোয়ার্ড বেঁচে থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। এখন আর তা দেয়ালের কাগজ বলে চেনা যায় না।

এই পর্যন্ত এই বাড়িটির বর্ণনায় মনে হতে পারে এবারে আমি অলৌকিক কোনো কাহিনী শোনাতে বসেছি। কিন্তু তা নয়। কোনো অলৌকিক ঘটনা সে বাড়িতে আমি ঘটতে দেখিনি যদিও পরে জেনেছি

আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরেই মিসেস বোস নামে একজন ভদ্রমহিলা কয়েক বছর আগে থাকতেন—পরে তিনি বাড়ির কাছেই বাস চাপা পড়ে মারা যান। আমি সেই মিসেস বোস সম্পর্কে অনেক কথা মিসেস ম্যাথার্সকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি মানুষের বর্ণনায় একেবারেই অপটু ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঐ ভারতীয়দের দেখতে যেমন হয় তেমনি আর কি। কালো চুল, কালো চোখ, আর সুন্দরী দেখতে। কিন্তু ঐরকম বর্ণনা তিনি সমস্ত ভারতীয়দের সম্পর্কেই করতেন। তিনি বাড়িতে ছিলেন সর্বেসর্বা—সমস্ত বাড়িতেই ল্যাণ্ডলেডিদের এই প্রধানত্ব জানা যাবে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে ঃ "বিলেতে ছোট খাট বাড়িতে বাড়িওয়ালা বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, বাড়িওয়ালীর সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক।" কথাটা এখনো সত্য। মিসেস ম্যাথার্স যেন পুলিসের 'অ্যালিবাই'-এর থিয়োরী অমান্য করে সমস্ত ঘর এক সঙ্গে দেখাশুনা কোরতেন। প্রতিটি ছোট বড় কাজে তাঁর নজর ছিল।

মিঃ ম্যাথার্স ঘরটি দেখালেন, যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ঘরে ঢুকে বললেন, নতুন ওয়ালপেপার দেয়া হ'য়েছে, নতুন বৈদ্যুতিক



হীটার আনা হয়েছে, নতুন টেবলক্লথ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখলাম ওয়ার্ডরোবের মাথার উপর নানা রকম পরিত্যক্ত জিনিস ছাড়ানো রয়েছে। বিছানাটা ছোট। পুলক সেটাতে বসে দেখলো তা কতখানি নরম। দেখে বললো, বিছানা ঠিক আছে, আর কি চাই ? অতএব সপ্তাহে তিন পাউণ্ড ভাড়ায় রাজি হ'য়ে এক পাউণ্ড জমা দিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরুলাম। পুলক বললো, ঘরটা তেতলায়, বেশ ভালই হবে। তা ছাড়া জানালা দিয়ে দেখে নিয়েছি বাড়ির পেছনে বাগান আছে—অতএব ভালই মনে হ'চ্ছে। তখন জানতাম না যে লণ্ডনে যত উঁচুতে ঘর হয় তত তার সম্মান এবং ভাড়া কমে যায়।

সব চেয়ে ভাল ঘর হ'ল এক তলার, যার নাম হ'ল গ্রাউণ্ড ফ্লর। এর তলায়ও ঘর থাকে, অর্ধেকটা যার মাটির নিচে, তা হল বেসমেণ্ট। আরো জানতাম না, লণ্ডনের এবং ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই একটু করে বাগান আছে—আর তা না করলে বাড়ি তৈরির অনুমতিই পাওয়া যায় না।

এই ঘটনাটি কোথাও পড়েছি : এক স্কচ ভদ্রলোক হোটেলে ঘর ভাড়া নিতে এসেছেন। ওরা জাতে হাড় কিপ্‌টে। (ইহুদিরা তুলনায় ছেলে মানুষ। একটা গল্প আছে ঃ একবার একটি নাটক হচ্ছিল। ধর্ম-সংক্রান্ত নাটকটির নাম, 'দি মিরাকল'। বিরাট বড় কিউএর শেষের দিকে ছিল একজন স্কচ। সে যখন টিকিট ঘরের কাছে পৌঁছল, তখন পঞ্চাশ শিলিং দামের কমে কোন টিকিট নেই। স্কচ ভদ্রলোক বললো, দেখি একটা। বলে পঞ্চাশ শিলিং পকেট থেকে বার করে গুনে দিলো। এই ব্যাপার দেখে একজন ইহুদি কিউ থেকে বেরিয়ে বাড়ি যেতে যেতে বিড় বিড় করতে লাগল—আই হ্যাভ সিন দি মিরাকল! আই হ্যাভ সিন দি মিরাকল!) হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লরের ভাড়া শুনলেন কুড়ি শিলিং, দোতলা আঠারো শিলিং, তেতলা পনরো শিলিং। স্কচ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? তারপরে কোন কিছু নেই? হ্যাঁ, আছে চারতলায় বারো শিলিং, পাঁচতলায় দশ শিলিং। হোটেলটা পাঁচতলা উঁচু। শুনে স্কচ ভদ্রলোক রাস্তায় নেমে এলেন। হোটেলের কেরানী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের হোটেলের দর পছন্দ হল না? উত্তর এলো ঃ দর পছন্দ হচ্ছিল—কিন্তু আমার আরো উঁচু হোটেল প্রয়োজন।

পুলককে বিদায় দিয়ে আমি জিনিসপত্র নিয়ে বেরুলাম রয়্যাল হোটেল থেকে। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে পৌঁছুলাম মিনিট পনরো কুড়ি পর। দিনের বেলা এই প্রথম পাড়াটা দেখলাম। দেখলাম প্রতিটি বাড়িই প্রায় একরকম দেখতে। প্রতিটি বাড়িরই একটি বিশেষ জায়গায় নম্বর লেখা

আছে। নম্বরগুলি ভাঙাচোরা নয়—জোড় এবং বিজোড় এই দুরকম নম্বর রাস্তার দু-পাশে। অর্থাৎ এক তিন পাঁচ সাত ইত্যাদি, অন্য পাশে দুই চার ছয় আট ইত্যাদি। কোলকাতায় যেমন পাঁচের পর একশো বারোর পঁচিশের দুইএর বি, বা দশের একের তিনের এ'র পরের বাড়িই সতরো আঠারো, লণ্ডনে মোটেই সেরকম নয়। এ থেকে প্রমাণ হয় ইংরেজরা এখনও প্যাঁচালো হিসেব আয়ত্ত করতে পারেনি। কেবল অসুবিধে নয়, এতে একঘেয়েমি আসতে বাধ্য। নম্বরের একঘেয়েমি ইংরেজদের চারত্রকে বোকা করে দিয়েছে। আমার মনে হয় এই একই কারণে ইংরেজরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে পঁচিশ বছর বাস করেও পরিচিত হয় না। আমাদের দেশের মত নম্বর ওদেশে থাকলে অবশ্য পরিচিতি হবার সমস্যা থাকত না। একজন অপরিচিত লোক ধরুন লণ্ডনের একটি রাস্তায় এলেন। তিনি চান পঁচিশের দুইএর একশো আট নম্বর বাড়ি। তিনি আধ মিনিটও রাস্তায় আসেন নি, মিঃ স্মিথ জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কাকে খুঁজছেন? আগন্তুক বললেন, আমি মিঃ ম্যাকনীলকে খুঁজছি, তাঁর বাড়ির নম্বর পঁচিশের দুইএর একশো আট নম্বর বাড়ি।

মিঃ স্মিথ: গোঁফ আছে?

আগন্তুক: বাড়ির গোঁফ থাকবে কেন?

মিঃ স্মিথ: আহা, বাড়ির কেন হবে, মিঃ ম্যাকনীলের গোঁফ আছে কি?

আগন্তুক: ভুলে গিয়েছি।

মিঃ স্মিথ: ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়—একজনকে খুঁজতে এসেছেন, তার গোঁফ আছে কিনা জানেন না?

আগন্তুক: বাড়ির নম্বর···

মিঃ স্মিথ: বাড়ির নম্বরে কোন কাজ হবে না। আমার নাম মিঃ স্মিথ····আপনার?

আগন্তুক: আমার নাম সীব্রুক।

মিঃ স্মিথ: আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

আগন্তুক ঃ এবং আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হলাম।

মিঃ স্মিথ ঃ আমার বাড়িতে আসবেন মাঝে মাঝে। ঐ যে লাল বাড়িটা ওটা আমার।

আগন্তুক ঃ নিশ্চয় আসব। এখানে কোনো 'পাব' আছে? একটু বীয়ার খাওয়া যাক!

মিঃ স্মিথ ঃ মিঃ ম্যাকনীলকে খুঁজবেন না?



আগন্তুক ঃ আপনি খুঁজে রাখবেন তাঁকে। আমি আবার আসব—আপনি ইতিমধ্যে চেষ্টা করলে আশা করি বাড়িটা খুঁজে ফেলতে পারবেন।

মিঃ স্মিথ ঃ তা পারব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। চলুন যাই।

তাঁরা 'পাবে' গেলেন। বীয়ার খেলেন—এবং তাঁদের বন্ধুত্ব চিরকাল ধরে চলল। কিন্তু বাস্তবে হায় তা ঘটে না। অন্তত লণ্ডনে তো নয়ই। ইংরেজরা যে কি হারাচ্ছে তা বোধ করি তারা জানে না।

বাড়িটা বহুদিন যে সারানো হয়নি তাতো প্রায় অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, দিনের বেলা কিছু ফাটল চোখে পড়ল। তবে ওতে ভাবনার কিছু নেই, বাড়ির পাশে বহুদিন আগে, সেই যুদ্ধের সময় একটা উড়ন্ত বোমা পড়েছিল, ফাটলটা সেই থেকেই আছে। খুব বিপজ্জনক হয়নি এখনো। রাস্তার উপরে প্রায় ভাঙা এবং ভাল এই দুজাতের মোটরগাড়ি থেমে আছে। কোনোটা আবার ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। প্রতিটি বাড়ির পেছনে যেমন, তেমনি সামনেও বাগান আছে, তবে আয়তনে ছোট, কিন্তু ফুল নেই। মাসটা নভেম্বর বলেই হয়তো। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টের সমস্ত রাস্তায় একটি লোকেরও দেখা পেলাম না, যদিও সকাল তখন এগারোটা। রাস্তার মোড়ে অতি উজ্জ্বল লাল রঙের চিঠির বাক্স। লণ্ডনের বাস, দমকল আর লেটার বক্স—এ

তিনটিই এখানে লাল রঙ করা দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য—আর ভালোও লাগে, ছাইরঙের সমুদ্রে এই লাল দ্বীপগুলি।

হাওয়াতে কিসের গন্ধ। কিছুটা কুয়াসার যেন আভাস, আর কেমন যেন কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। কিছুক্ষণ সে হাওয়ায় থাকবার পর প্রায়ই সর্দি হয়। সমস্ত লণ্ডনের লোকেরা সর্দিতে ভোগে! এখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অ্যাসপিরিন বড়ি বিক্রি হয়। অবশ্য অ্যাসপিরিন অনেক কারণেই লোকে ব্যবহার করে—পরিশ্রান্ত লণ্ডনবাসীদের মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করতে এর সাহায্য নেওয়া হয়। একজন আমেরিকান প্রকাশক বর্তমানকালকে অ্যাসপিরিন যুগ বলে অভিহিত করেছেন। লণ্ডনের হাওয়ার একটি বিশেষ গন্ধ আছে, সে গন্ধ থেকেই বোঝা যায় কি মাস তখন। অন্তত কী ঋতু সেটা বোঝা সহজেই যায়। অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই ছমাস ধরে ঘর গরম করবার জন্য কয়লার ব্যবহার খুব বেশি হয়। এই কয়লার ধোঁয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় লণ্ডনের শহরতলীর কারখানার ধোঁয়া। এ ধোঁয়া কুয়াসা হলে উড়ে যায় না, কুয়াসার সঙ্গে মিশে থাকে। যাঁদের নস্যি নেওয়া অভ্যেস, তাঁদের ছাড়া প্রত্যেকেরই বেশ অসুবিধা হয়। সাধারণ নাকের পক্ষে এ ধোঁয়া অসহ্য, তবে কোলকাতায় যাঁরা থাকেন তাঁদের তুলনায় লণ্ডনের লোকেদের অনেক কম ধোঁয়া নাকে নিতে হয়।

বাড়ির মধ্যে ঢুকলে ধোঁয়ার তীব্রতা কমে আসে। ইংরেজদের বাড়ি মানে একটি দুর্গ, কথাটা ইংরেজরাই বলে থাকেন। অবাঞ্ছিতদের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। ধোঁয়া এবং কুয়াশা অবাঞ্ছিত, অতএব বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে না, কারণ কাচের জানালা দিয়ে তাদের পথ বন্ধ করা থাকে। একেবারে ঢোকে না তা নয়, হাওয়ার সঙ্গে ধোঁয়াও কিছুটা ঢোকে। এই ধোঁয়া এড়াবার একমাত্র উপায় বিদ্যুতের সাহায্যে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, তাহলে ইংরেজ চরিত্রের আর বাকী থাকে কি? এরা জাত রক্ষণশীল। পুরোনো জিনিস, ব্যবস্থা ইত্যাদিই এদের পছন্দ।

আমার ঘরটি দিনের আলোয় মন্দ লাগলো না। আমার জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনে অনেক দূর দেখা যায়। বাড়ির পেছনে অযত্নে রাখা একটা বাগান। আকাশে মেঘ, যেন মৌসুমি লণ্ডনেও ধাওয়া করেছে ; ঘন কালো মেঘ, বৃষ্টিহীন।

প্রথম আলাপ হ'য়েছিল ব্লেনিম ক্রেসেণ্টের বাড়িতে যার সঙ্গে তার নাম জীবন লোকুড়। জাতে মারাঠি, সুগঠিত দেহ, কোঁকড়া চুল, সব সময় একটু বাঁকা হাসি লেগে রয়েছে, কিন্তু হাসিটাই বাঁকা। চোখ দুটি শিশুর মতো সরল এবং কৌতুকময়। উজ্জ্বল তামাটে রঙ তার, ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। আমার জিনিসপত্র নিয়ে উপরে তুলে দিল তিন তলায়, অনুরোধ করতে হ'ল না। সে আমাকে জিজ্ঞেসই করলো না আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা। সে ধরেই নিল আমার প্রয়োজন আছে, এবং অযথা তা নিয়ে সে কথা বললো না। আমার জিনিসপত্র সে তুলে দিয়ে বললো—এ বাড়িতে এলে, বাড়িটা খুব ভাল নয়। আমি বল্‌লাম, পরে খুঁজে বার করবো কোনো একটা আস্তানা! জীবন বললো, মুশকিল কি জানো, এখানে কিছুদিন থাকলে খুব অলস হ'য়ে পড়ে লোকেরা, আর বাড়ি খুঁজতে মন বসে না। আমি নিজেই তো গত ন'মাস ধরে অন্য কোথাও চলে যাবো ভাবছি! প্রত্যেক সপ্তাহেই কোনো না কোনো বাধা এসে উপস্থিত হয়।



আমি বললাম, যাই হ'ক, বাড়িটা সস্তা যখন, তখন এখানে একটু কষ্ট করে হলেও থাকতে হবে বৈ কি!

জীবন বললো, মুশকিল হচ্ছে এই যে এখানে কষ্টটারই অভাব! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমাকে ভাবতে হ'চ্ছে না কিচ্ছু। মিসেস ম্যাথার্স ঘর পরিষ্কার করছেন, ব্রেকফাস্ট তৈরি করছেন, প্লেট ধুচ্ছেন, খাওয়ার ঘরে কয়লা জ্বালছেন, বাজার করছেন। ফলে আমাদের

প্রকৃতি অলস হ'য়ে পড়ছে! এমন একটা জায়গায় যাবো যেখানে অন্তত নিজের রান্না নিজে করতে বাধ্য হই, আর ঘরটাও পরিষ্কার করতে চাই।

ভারতীয়রা পরিশ্রম করতে চায় না একথাটা আর সত্যি বলে মনে হ'ল না। অন্তত একজন যে পরিশ্রম করতে চায় তার প্রমাণ পেয়ে বড় ভাল লাগলো। আধুনিক যুগে ভারতীয়দের সম্পর্কে নানারকম বদনাম শোনা যায়—কর্মবিমুখতা তাদের অন্যতম। আমি বিস্মিত ভাবে জীবন লোকুড়কে দেখলাম। এই একটিমাত্র লোককে আমি দেখলাম যার স্থখ সহ্য হ'চ্ছে না। কিন্তু একটু পরেই আমার ভুল ভাঙলো, এবং সে ভাঙা আর জোড়া লাগে নি।

আমি জীবনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করো? জীবন বললো, আমি আইন পড়ি আর দিনের বেলায় ভারতভবনে কেরানীগিরি করি।

আমি বললাম, তা তুমি অফিসে যাওনি যে?

জীবন বললো, কি হবে গিয়ে? ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়েছি আমি অসুস্থ। পনরো দিন যাবো না, অবশ্য না গেলেও কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের সেকশনে কেউ কাজ করে না—কাজ করবার কিচ্ছু নেই সেখানে। যেটুকু আছে তা আমার অফিসে না গেলেও আটকে থাকবে না। এই ব্যাপারটা কেবল ভারতীয় নয়, সরকারী অফিস মাত্রেরই এই দুর্দশা বলে আমার ধারণা—তা সে দেশ বৃটেনই হক বা অ্যামেরিকা রাশিয়াই হক।

মিসেস ম্যাথার্স ছিলেন জাতে আইরিশ এবং যথেষ্ট মোটা। তিনি সমস্ত সময়েই খারাপ নোংরা পোশাক পরে থাকতেন। রবিবারটা ছিল স্বতন্ত্র। সেদিন চার্চে যাবার দিন। বয়স ষাট বছরের কাছাকাছি কিন্তু পঞ্চাশ বছর বললে খুশি হ'তেন। মিস্টার ছিলেন ইংরেজ, রাজনীতিতে না রক্ষণশীল না শ্রমিক, একেবারে প্রায় জাতহীন লিবারাল। দুজনের ধর্ম ছিল আলাদা। মিস্টার ছিলেন প্রোটেস্টাণ্ট

আর মিসেস ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। খাবার ঘরে একটা বাঁধানো এবং ছাপানো বাণী টাঙানো ছিল, তার বাংলা হ'চ্ছে. যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার ভেঙে যায় না। তাঁদের



মধ্যে অন্য কোনোরকম ঝগড়াঝাঁটি দেখিনি—অন্তত ধর্মবিষয়ে। খাওয়ার ঘরে একটা পুরোনো বিলিতি পিয়ানো ছিল, মাঝে মাঝে তার উপর আমরা আমাদের সঙ্গীতের অজ্ঞতার প্রমাণ দিতে বসতাম।

তাঁরা দুজনে অন্ধকারময় একটি ঘরে থাকতেন, সূর্যালোক তাতে প্রবেশ কোনোদিনই করত না। সূর্যালোক অবশ্য লণ্ডনের কম ঘরেই প্রবেশ করে। এককালে ধারণা ছিল এদেশে যে সূর্যের আলো গায়ে লাগলে নানা রকম রোগ হয়—সেজন্য বাড়িগুলোর জানালা এমন দিকে করা হত যেদিক দিয়ে কোন রোদ কোনমতেই ঢুকতে পারত না! মিস্টার ম্যাথার্স, মিসেস ম্যাথার্সের মতোই নোংরা ছিলেন, তবে গুণের মধ্যে তিনি বিশেষ কথা বলতেন না। প্রায়ই গলা দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করতেন। সে আওয়াজের মানে বোঝা আমাদের সাধ্য ছিল না। আমরা তা বুঝবার চেষ্টাও করতাম না! পাইপ টানতেন বোকা বোকা মুখ করে, আর বিষাদময় মুখ তাঁর কোনোদিনই আনন্দে উদ্ভাসিত দেখিনি। তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। সমস্ত বাড়ির কাজ নিজেরাই করতেন। এই কাজের মধ্যে সকাল থেকে বাড়ির সবার জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করা, নানা লোককে নানা সময়ে সকালে ডেকে তোলা। ডেকে তোলার ভার ছিল মিস্টার ম্যাথার্সের উপর। তারপর ব্রেকফাস্ট টেবিল সাজানো, টোস্ট করা, বেকন এবং ডিম ভাজা। এত হালকা ক'রে কাটা বেকন আর কোথাও দেখিনি। এরকম ভাবে বেকন কাটা প্রায় আর্টের পর্যায়ে পড়ে, তুলনা করা চলে অনেকটা ঢাকাই মসলিনের সঙ্গে। তার সঙ্গে চর্বির ভেজাল—সমস্ত বেকনের সঙ্গেই কিছু কিছু চর্বি অবশ্য লেগে থাকে। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে কখনো আমাদের মোটা বেকন জোটেনি। ব্রেকফাস্টের

সময় আমরা প্রচুর চা খেতাম। এ ব্যাপারে মণি পালিত বোধ হয় রেকর্ড ভঙ্গ করতেন। তিনি রোজই ব্রেকফাস্টের সময় চার পাঁচ কাপ চা ধীরে সুস্থে খেতেন। সে চা-কে চা বলাটা বোধ হয় ভুল। আমাদের দেশ থেকে সে চা যেত, কিন্তু আমার মনে হয় তার সঙ্গে কাঠের গুঁড়োও কিছুটা মেশানো থাকতো! কিন্তু আমার ভুল হ'তেও পারে। ইংরেজদের চা তৈরির কায়দাটা একটু অন্যরকম। কনকনে ঠাণ্ডা দুধ দিয়ে চা হয়, আর প্রায়ই ছাঁকনির ব্যবহার হয় না। আমাদের কাছে সে চা বেজায় খারাপ মনে হত, কিন্তু অভ্যেসে কিনা হয়, কিনা হয় চেষ্টায়—এ সমস্ত কথা এবং সাহেবরা খেতে পারে আর আমরা পারব না! এমন একটি ভাব চা খাবার সময় মনে উদয় হত।



জ্যাম, জেলি, মারমালেড টেবিলের উপর সাজানো থাকতো যত খুশি তা থেকে খাওয়া চলতো, কিন্তু খুব বেশি খুশি হতাম না তা খেয়ে। বাজারের সবচেয়ে সস্তা জিনিসের স্বাদ কদাচিৎ ভাল হ'য়ে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে মিসেস ম্যাথার্স ই একমাত্র খারাপ জিনিস খাওয়াতেন তা নয়। যত ল্যাণ্ডলেডির কথা শুনেছি, দু' একজন ছাড়া সবাই খারাপ খাবারের প্রতিযোগিতা করতেন।

চায়ের সময় চিনিরও বেশ টানাটানি ছিল। প্রত্যেক মাসে পেতাম এক সেরের কিছু কম চিনি। তা দিয়ে চা খেতে হ'ত আর পরিজ খেতে হ'ত। মাসের পনরো-কুড়ি তারিখের মধ্যেই আমার চিনি কমে আসতো। আমরা চিনি ছাড়াই চা খেতে অভ্যেস করেছিলাম, কারণ পয়সা দিলেও আর চিনি মিলত না—তখনও বৃটেনে চলছিল র‍্যাশনিং। মনের মতো চা আমাদের ভাগ্যে মিসেস ম্যাথার্সের বাড়িতে কখনো জোটেনি।

মিসেস ম্যাথার্স নোংরা জলে আমাদের খাবার প্লেট ধুয়ে নোংরা কাপড় দিয়ে সেটাকে মুছে দিতেন। ছুরি-কাঁটা আমাদের পাড়ার পোর্টোবেলো রোডের হাট থেকে কেনা সস্তায়। সেগুলো কোনো

ক্লাবের বা হাসপাতালের ছিল কোনো এককালে, তা ছুরি-কাঁটা চামচের উপরকার আদ্যাক্ষরগুলি দেখলেই বোঝা যেত। ছুরি পরিষ্কার দেখাতো, যদিও তাতে ধার থাকতো না। মাংস কাটতে অনেকখানি সময় লেগে যেত। মাংস মাঝে মাঝে ভাল সেদ্ধ হ'ত, প্রায় সময়েই পেতাম প্রায় অসিদ্ধ। মাংস হয়তো ছ' সাত মাসের পুরোনো। বৃটেনের সমস্ত মাংস বৃটেনে হয় না, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি জায়গা থেকে চালান আসে। আসতে সময় লাগে। ঠাণ্ডা ঘরে সে মাংস থাকতে থাকতে জমে কঠিন হ'য়ে যায়—স্বাদের কিছু পরিবর্তন হয়।

ছুরি পরিষ্কার পাওয়া গেলেও কাঁটা কখনোই পরিষ্কার দেখিনি। কাঁটার মধ্যে পুরোনো খাবার লেগে প্রায়ই থাকতো, সেগুলো মিসেস ম্যাথার্সের ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়ত না। সেগুলো ভাল করে না ধুয়েই মুছে ফেলা হ'ত। আমরা যে কোনরকম মাংসই খেতাম বা খেতে প্রস্তুত ছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করতাম না কিসের মাংস খাচ্ছি। তবে যখন অপেক্ষাকৃত টাটকা মাংস পাওয়া যেত তখন বুঝতাম তা হ'ল ঘোড়ার মাংস। আমাদের পাড়ায় ঘোড়ার মাংসের একটা দোকান ছিল। লণ্ডনে ঘোড়ার মাংস খুব অপ্রচলিত নয়। অনেক রেস্তোরাঁই ঘোড়ার মাংস সরবরাহ করে। ঘোড়ার মাংস আমরা লণ্ডনে জেনে না জেনে অনেক খেয়েছি। কখনো সন্দেহ হয়েছে ঘোড়ার মাংস বলে। তা নিয়ে রেস্তোরাঁওয়ালাকে বলেছি—বদলে দিতে নয়—ঘোড়ার মাংসের দাম কম, অতএব পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে। রেস্তোরাঁওয়ালারাও বিনা প্রতিবাদে মাংসের বরাদ্দ খানিক বাড়িয়ে দিত।

একদিন প্রভাস চৌধুরী নামে আমাদের এক বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে এসে আমাদের বললো, সর্বনাশ হয়েছে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না লণ্ডনের এই নারকীয় খাদ্য। ঘোড়ার মাংস পর্যন্ত রাজী ছিলাম, কিন্তু বেরালের মাংস! এই লণ্ডনের লোকেরা কি ছাগল, এরা কি না খায়! উত্তেজনায় তার প্রায় দম বন্ধ হ'য়ে যায়।

জীবন জিজ্ঞেস করলো, বলি, ব্যাপারটা কি ?

প্রভাস বললো, আর বলো কেন ভাই, এক্ষুনি দেখে এলাম দোকানে বেরালের মাংস বিক্রি করছে।

মণি পালিত স্তম্ভিত ভাবে প্রভাসের দিকে তাকালেন। মণি পালিতের বয়স আমাদের চাইতে কয়েক বছর বেশি, লণ্ডনে অনেকদিন আছেন এবং লণ্ডন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। অতএব আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার মণিদা ?

মণিদা বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধহয় খরগোসের মাংস হবে। খরগোসকে চামড়া ছাড়ালে অনেকটা বেরালের মতো দেখতে হয় বটে।

প্রভাস আরো উত্তেজিত হ'য়ে বললো, না—না—আমি দেখে এলাম একটা মাংসের দোকানের বোর্ডে স্পষ্ট লেখা আছে বেরালের মাংস পাওয়া যায়।



আমি বললাম, ঠিক কি লেখা আছে বলো ত !

তখন প্রভাস বললো, লেখা আছে Cats Meat।

মণিদা তখন হেসে উঠে বললেন, এই ব্যাপার ? না বেরালের মাংস নয়। —ওটা হবে বেরালের জন্য মাংস, বুঝলে ?

লণ্ডনে যে সমস্ত ঘোড়ার মাংসের দোকান ছিল সেগুলির সরবরাহ আসত বেশির ভাগ আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে। মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েনে এ সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ; তাতে অবশ্য ঘোড়াদের দুঃখ কমেনি।

আমাদের টেবিলে জলের গেলাস থাকত না। প্রত্যেক খাবারের সঙ্গেই থাকতো চায়ের বন্দোবস্ত। আমরা বিশেষ করে জলের বন্দোবস্ত করেছিলাম নিজেদের জন্য। আমাদের চায়ের কাপ একটিও অক্ষত

ছিল না—মনে হয় সেগুলি পোর্টোবেলো রোডের হাট থেকে কেনা। আমাদের পাড়ায় পোর্টোবেলো রোডে প্রতি শনিবারে হাট বসতো। অর্থাৎ ফুটপাথ রাস্তা ভ'রে যেত দোকানদার আর তাদের পসরায়। সেখানে যতরাজ্যের শাকসবজী আপেল, কমলালেবু, পেয়ারা, বেকন, বিস্কুট, সাবান, ডিম, তো পাওয়া যেতই—তা ছাড়া পুরনো জিনিসপত্রেরও বহু দোকান সেখানে ছিল। সেখানে পুরনো বই গ্রামোফোন, রেকর্ড ইত্যাদি পাওয়া যেত। এখানে দেখতাম মিস্টার আর মিসেস ম্যাথার্স বাজার করছেন, আর কিনছেন বাজারের সবচেয়ে সস্তা জিনিসগুলি।

আমাদের বাড়িভাড়া ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণত ছাত্রদের দেখেছি অন্যত্র থাকতে চার সাড়ে চার পাউণ্ড খরচ করতো। আমাদের বাড়িতে খরচ ছিল আড়াই পাউণ্ড। পৃথক ঘর নিলে দশ শিলিং বেশি। একা থাকা অতএব আর পছন্দ হল না। সপ্তাহে দশ শিলিং কম খরচ হবে, এজন্য নিচের একটি লোক চলে যেতেই নেমে এলাম একদিন। আমার ঘরটি আয়তনে ছোট ছিল এবং খুব ঠাণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু ঘরটা আমার নিজস্ব ছিল। পাশেই ছিল চানের ঘর—যদিও সপ্তাহে একবারের বেশি চান আমরা কেউই করতাম না পারত পক্ষে। লণ্ডনের অনেক বাড়িতে আবার চানের ঘরই নেই। বহুলোক বছরের পর বছর প্রায় চান না করে থাকেন। তবে যুদ্ধের পর থেকে জনসাধারণের মধ্যে চানের অভ্যেসটা ক্রমশ বাড়ছে। অনেকগুলি সাধারণ স্নানাগার আছে সেখানেও অনেকে চান করে থাকেন। তবে লণ্ডনের স্নানাগার খুব বেশি পরিষ্কার নয়—যদিও খরচ হয় প্রায় ন আনার কাছাকাছি প্রতিবার। চানের জন্য টবেরই প্রচলন বেশি—শাওয়ার বাথ প্রায় নেই। তবে টার্কিশ বাথের কিছু প্রচলন আছে। যাদের টাকা খরচ করবার মতো ক্ষমতা এবং সময় প্রচুর আছে তারা টার্কিশ বাথে গিয়ে ধোলাই হ'য়ে আসতে পারে।

এইবার তখনকার আমলের রাজনৈতিক ঘটনার কিছু উল্লেখ

করছি। কিছুদিন আগেই বিখ্যাত চার্চিল এসেছেন রক্ষণশীল দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হ'য়ে। রক্ষণশীল দল পেয়েছেন ৩২১টি আসন। আর অ্যাটলির শ্রমিকদল পেয়েছে ২৯৪টি আসন। যদিও বেশি লোক শ্রমিকদের ভোট দিয়েছে। শ্রমিকদল দু'লক্ষ ভোট বেশি পেয়ে সরকার গঠন করতে পারলো না এ নিয়ে তখন কাগজে অনেকরকম লেখালেখি চলছিল। এবারে অন্য পার্টিগুলির কথা বলা যাক— লিবারাল দল পেয়েছিল ছটি আসন, ভোট পেয়েছিল শতকরা আড়াই। আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা কমিউনিস্টদের—তারা সর্বসাকুল্যে পেয়েছিল বাইশ হাজার ভোট, যেখানে অন্যান্য দল সবাই মিলে পেয়েছিল প্রায় তিন কোটির কাছাকাছি। বৃটেনে কমিউনিস্টরা ভোটে না জিতলেও শ্রমিকসংঘে তাদের বেশ প্রতিপত্তি দেখা যায়। কিন্তু তাদের সেখান থেকেও ক্রমশ হটতে হচ্ছে প্রতিদিনই। নিউজ ক্রনিক্‌ল পত্রিকা রাজনৈতিক পরিস্থিতি দু'তিন লাইন প্রকাশ করেছিল, The people have cast out a party they no longer want, in favour of one they do not trust. No one has any right to be pleased.

তবে ভোট দিয়েছে লোকে প্রচুর। শতকরা বিরাশিজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিউ করে দাঁড়িয়েছিল ভোট দিতে। কোনো রকম উত্তেজনা, মারামারি, অগ্নিকাণ্ড, মাথা ফাটাফাটি হয়নি। বৃটেন এ ব্যাপারে আশ্চর্য শান্ত। প্রধান দল দুটির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি দেখা যায়। চেহারায়, কথাবার্তায়, ব্যবহারে, এক কাপ চায়ের জন্যে কিউতে, কর্মে, আলস্যে, এই দুটি দলের এত বেশি মিল যে আসলে ভোট দেওয়া নেওয়া অনেকটা ফুটবল খেলার মতো। যে দলই জিতুক না কেন, সামগ্রিকভাবে দেশের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। অ্যাটলি এবং চার্চিল ছোটবেলা থেকেই বন্ধু এবং যতদূর মনে পড়ছে কোথাও পড়েছি, তাঁরা দুজনে একই ইস্কুলে, একই ক্লাসে পড়াশুনাও করেছিলেন।

আমাদের বাড়িতে আমরা কিছু ভারতীয় ছিলাম, আর ছিল কিছু আইরিশ। এরা নাকি নিজেদের দেশে খুব মারপিট করতে অভ্যস্ত। একটি গল্প আছে, রাস্তায় বেশ মারামারি চলেছে, একটি ছোট্ট ছেলে এসে জিজ্ঞেস করলো, একজন দর্শককে, বলতে পারেন মারামারিটা কতক্ষণ চলবে ?

—কেন ?

—বাবা চান করতে গেছেন, তিনি এসে এই মারামারিতে যোগ দিতে চান কিনা, তাই জানতে চাইছেন।

'দি কোয়ায়েট ম্যান' নামের একটি বিখ্যাত ফিল্মে আইরিশদের এই হাঙ্গামা-প্রিয়তার অনেক ঘটনা আছে। একটি ঘটনায় দেখা যায় এক বুড়ো ভদ্রলোক মৃত্যুশয্যায়—পুরোহিত এসে প্রার্থনা করলেন, বুড়োর চোখ বুজে এলো যেন চিরকালের জন্য। কিন্তু না, হঠাৎ দূর থেকে আওয়াজ এলো দাঙ্গা হচ্ছে। লোকটি যেন দৈবশক্তিতে উঠে বসলো, তার পর মৃত্যু স্থগিত রেখে একটা দু'সেরি লাঠি নিয়ে ছুটলো সেই দাঙ্গার উৎস সন্ধানে।



অথচ দেখলাম ব্লেনিম ক্রেসেণ্টের আইরিশরা নেহাতই শান্ত, এমন কি গোবেচারাও বলা চলে। একটু লাজুক প্রকৃতিরও তারা। ধীরে ধীরে কথা বলে। আমাদের সঙ্গে কোনো বাগ্‌বিতণ্ডায় যেতে রাজী হয় না, মারামারি করা দূরের কথা। তারা আমাদের টেবিলেও বসে না, একটু দূরে দূরে বসতে পারলে বাঁচে। আমাদের অবশ্য আইরিশদের সঙ্গে সাধারণ কোনো কথা আলোচনা করবার থাকত না। ভারতীয়দের সবাই আলোচনা করতো কৃষ্ণ মেনন, ডাঙ্গে, রজনী পাম দত্ত, মোরারজী দেশাই, রবীন্দ্রনাথ এবং মস্কো ওয়াশিংটন সম্পর্কে। আইরিশরা আলোচনা করতো কারখানা, শ্রমিক-সমস্যা, থাকার জায়গার সমস্যা—কেবল এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাদের কিছু মিল ছিল।

এ ছাড়া তারা যে আর কি ভাবতো বা বলতো, তা আমাদের জানবার উপায় ছিল না। তবে হাইড পার্কে যে সমস্ত আইরিশ মুষ্টিবদ্ধ হাতে গলা ফাটিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডকে এক করবার স্বপক্ষে যুক্তি এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার হুমকি দেখাতো, তাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির আইরিশদের ছিল বিশেষ পার্থক্য। আমাদের বাড়ির একজন আইরিশ একদিন তো বলেই ফেললেন যে তিনি ডি ভ্যালেরার সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং তিনি আরো জানালেন, জানবার উৎসাহ পর্যন্ত নেই। আইরিশরা আসে লণ্ডনে কাজ করতে, দেশে টাকা পাঠাতে, কারণ তাদের দেশ নেহাতই গরিব। বহু যুগ থেকেই আইরিশরা বিদেশে ছুটেছে বসতি করতে। আমেরিকায় প্রথম যুগে যে সময় লোক সে দেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আইরিশ।

লণ্ডনে তিন জন আইরিশ ভদ্রলোক খুব নাম করেন। তিন জনই ইংরিজী জীবনযাত্রা, ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি ইত্যাদিকে আক্রমণ করেছেন কঠোর ভাষায়। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লেন বার্নার্ড শ'। ভারতবর্ষ বার্নার্ড শ'কে ভোলেনি, যদিও ইংল্যাণ্ড তাঁকে ইতিমধ্যেই ভুলতে বসেছে। বার্নার্ড শ'-এর অ্যায়োট সেণ্ট লরেন্সের বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে একজন অ্যামেরিকানকে। বার্নার্ড শ'কে ভুলবার একটি কারণ হ'ল, বার্নার্ড শ' ইংরেজদের সমাজ-ব্যবস্থা পছন্দ করেননি। সমালোচনা ইংরেজদের হৃদয় স্পর্শ করে না, বিশেষত সমালোচক যদি বিদেশী হয়, তাহ'লে তো কোনো আশাই নেই সে সমালোচকের। অস্কার ওয়াইল্ডও ইংরেজদের জীবনযাত্রা নিয়ে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই দুর্নীতির জন্য জেলে যান। ঐ একটি অপরাধে অস্কার ওয়াইল্ডের সমস্ত খ্যাতি ধূলিসাৎ হ'ল। ইংরেজদের সমালোচনা করার প্রতিশোধ ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত নিতে পেরেছিল। আর ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস, এঁর কথা ইংরেজরা শুনলো না, কারণ এঁর অতীত কিছুই জানা যায় না। বার্নার্ড শ'এর জীবনীকার এবং

আত্মজীবনী লেখক ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস মিথ্যাবাদী বলেও যথেষ্ট বিদ্রূপ সহ্য করেছেন।

তিনতলার ঘরটি একদা ছেড়ে দিলাম। বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো, এমন ইচ্ছে তখনো হয়নি ; ঐ বাড়িরই একতলায় নেমে এলাম। এই একতলার ঘরটি ছিল আকৃতিতে যথেষ্ট বড়। ঘরে হেঁটে বেড়ানোর মত জায়গা। ঘরের মধ্যেই ছিল জলের বেসিন। উপরের ঘরটাতে তা ছিল না—জলের জন্য পাশের ঘরে যেতে হ'ত। সেখানে জল গরম করবার বহু পুরোনো কল ছিল। সেটি পুরোনো হ'লেও কাজ চলতো, কিন্তু একটু বিপদও ছিল। জল গরম করবার গ্যাসের কলে একটা পাইলট লাইট জ্বালানো প্রয়োজন হ'ত, কিন্তু আমাদের গ্যাসের কলটির পাইলট লাইট খারাপ ছিল ব'লে জ্বলতো না সব সময়ে। ফলে দেশলাই-কাঠি দিয়ে গ্যাসে আগুন ধরাতে হ'ত। দেশলাই-কাঠিটি যদি আগে জ্বালিয়ে পরে গ্যাস খোলা হ'ত তাহ'লে বিপদ ছিল না। কিন্তু গ্যাস আগে খুলে পরে দেশলাই-কাঠি জ্বালালে বিস্ফোরণ হত। প্রায়ই একটা না একটা বিস্ফোরণ লেগে থাকতো। বিশেষত নতুন কোনো ভারতীয় এলে সংখ্যাটাও বাড়তো। গড়ে সপ্তাহে তিনটে করে বিস্ফোরণ হ'ত।



সব চেয়ে বড় বিস্ফোরণটি ঘটেছিল যেদিন, সেদিন রবিবার—জানুয়ারি মাস। অরুণ পালিত, আমি, প্রভাস চৌধুরী এবং তরুণ রায়, (বর্তমানে ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে পরিচিত) সেদিন ব্রাইটনে যাবো, সপ্তাহ তিনেক আগে থাকতেই কোচের টিকিট কিনে রেখেছিলাম। সকাল ন'টায় ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশন থেকে কোচ ছাড়বে, অতএব সকাল সকাল উঠতে হ'ল সেদিন। রবিবার ব'লে যে ন'টা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকবো তার উপায় রইল না। সকাল বেলাতেই প্রভাস খুব আগ্রহ করে আমাকে আর অরুণকে ডেকে তুললো। ওরা

দুজনে একই জাহাজে এসেছিল, এবং দুজনে মিলে একসঙ্গে ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে এসেছিল।

প্রভাস আমাদের ডেকে তুলে মুখ ধুতে গেল ওপরে। আমি এবং অরুণ আমাদের ঘরের বেসিনে মুখ ধুচ্ছিলাম। হঠাৎ আওয়াজ হ'ল। নতুন এসেছিল এক ব্যানার্জি, সে সেই আওয়াজ শুনে প্রায় অজ্ঞান—সে তার আগের দিন রাত্তিরেই শুনেছে যে বহু জার্মান বোমা অবিস্ফোরিত অবস্থায় এখনো লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় র'য়ে গেছে। কখনো কখনো সেগুলো ফাটতেও পারে।

ব্যানার্জি বললো, এ যে খুব কাছে। বোধ হয় জার্মান ভি-টু!

ব্যানার্জি ভয়ে কাঁপছে। অরুণ সংক্ষেপে বললো, গ্যাস। ব্যানার্জি গ্যাস শুনে আরো আতঙ্কিত হ'য়ে পড়লো। অরুণ বললো, প্রভাস—প্রভাস ক'রেছে এই কাজ! চলো, উপরে যাই। উপরে গিয়ে দেখি, স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ।

আমার নতুন ঘরের দু'জন আইরিশ, মার্টিন এবং মাইকেল দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। মিস্টার এবং মিসেস ম্যাথার্স এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের বাড়ির জীবন লোকুড়, চার জন ব্যানার্জি (এঁদের বুড়ো মেজো, সেজো এবং ছোট ব্যানার্জি বলে ডাকা হ'ত) আরো দু-তিনজন দাঁড়িয়েছেন। মণি পালিত সাণ্ডে টাইমস্ হাতে।

দরজা খুললো না, অতএব ভাঙা হল। ভাঙতে বিশেষ কষ্ট হল না। একটু চাপ দিতেই কাজ হল।

অরুণ বললো, তিনতলায় এতগুলি লোক এসে দাঁড়ানোয় একটা বিপদ আছে—বাড়িটা ভেঙে পড়তে পারে। এতগুলি লোকের ভার সইবে না।

এই শুনে জনকতক ব্যানার্জি নেমে গেল।

এই চার জন ব্যানার্জি নিয়ে দিব্যি গোলযোগ বেধে যেতো—বিশেষত টেলিফোন কল এলে। মিসেস ম্যাথার্স টেলিফোন ধরেই বলতেন চেঁচিয়ে—মিস্টার ব্যানার্জি! টেলিফোন!



চার জন ব্যানার্জি ছুটতো টেলিফোন ধরতে। এক জন টেলিফোন ধরতো—হ্যালো। অন্য তিন জন দাঁড়িয়ে থাকতো অধীর আগ্রহে।

এক বাড়িতে বহু ব্যানার্জি থাকায় আরো অনেক কাণ্ড হ'ত। বিশেষ ক'রে কেউ যদি বাড়িতে এসে ফিরে যেতো।

ডিনার খেতে খেতে হয়তো মিসেস ম্যাথার্স বললেন, আজ মিঃ ব্যানার্জির কাছে এক জন এসেছিলেন।

চার জন ব্যানার্জি একত্রে জিজ্ঞেস করতো, কার কাছে?

—কার কাছে, তা তো জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গিয়েছে।

—কী নাম?

মিসেস ম্যাথার্স বলতেন, নামটা ঠিক মনে রেখেছি। হুঁ মনে পড়ছে—মিস্টার স্টোকার—জাতে ভারতীয়।

মিস্টার স্টোকার ব'লে কোনো ব্যানার্জিই কাউকে চেনে না।

—স্টোকার, ঠিক মনে আছে মিসেস ম্যাথার্স?

—নাকি সেকার? সেকারও হ'তে পারে।

—সরকার নয়?

—নাঃ, স্পষ্ট মনে পড়ছে এখন—সরকার নয়। তবে স্টোকার না-ও হ'তে পারে।

চার ব্যানার্জি দাঁতে দাঁত ঘষত। ব্যানার্জিদের নিয়ে মজা আমরাও করতাম।

ডিনার টেবিলে একজন বললেন, একটি মেয়ে ব্যানার্জিকে টেলিফোন করেছিল, কিন্তু ব্যানার্জি নেই শুনে ছেড়ে দিলো টেলিফোন।

—কী নাম? চারজন ব্যানার্জির একটি প্রশ্ন।

—কী জাত?

—ইংরেজও হ'তে পারে, আবার জার্মানও হ'তে পারে—ভারতীয় হওয়াও আশ্চর্য নয়!

ডিনারের পর টেলিফোনের সামনে আবার কিউ। চারজন ব্যানার্জি তাদের চেনা সমস্ত মেয়েকে টেলিফোন করতে শুরু করেছে।

যাই হ'ক দরজা ভেঙে দেখা গেল প্রভাস বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত মুখ কাঠকয়লার মতো কালো। তার মাথার সুন্দর চকচকে চুলগুলির উপর ধুলো বালি জঞ্জাল। পাশে জল গরম করবার কল কাত হ'য়ে পড়ে আছে। ছাদের অনেকখানি অংশ বাথ-টাবে এসে ভেঙে পড়েছে। ঘর ভাঙা ইঁট বালি সিমেণ্টে ভর্তি। প্রভাস একেবারেই নীরব।

অরুণ এগিয়ে গেল। ডাকলো, প্রভাস ! প্রভাস !

কোনরকম সাড়া নেই।

আমরা প্রভাসকে ধরে নিয়ে এলাম নিচের ঘরে। আস্তে আস্তে প্রভাসের জ্ঞান ফিরে এলো।

—আমি কোথায় ? সে জিজ্ঞেস করলো।

—লণ্ডনে। অরুণ বললো।

—লণ্ডন কোথায় ?

অরুণ বললো, ইয়ার্কি মারছিস নাকি ?

কিন্তু প্রভাস ইয়ার্কি মারছিল না।

কোনোক্রমে ব্রাইটনের কোচ ধরেছিলাম। ব্রাইটন লণ্ডন থেকে বাহান্ন মাইল দূর, কোচে যাতায়াত ভাড়া সাড়ে সাত শিলিং—কোচে গিয়ে নিজেদের সীটে বসে কাগজ খুললাম।

প্রথম খবর নয়, কিন্তু মারাত্মক একটি খবর দেখে চমকে উঠলাম। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে এতই কুয়াসা হবে যে এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাবে না। Visibility nil—আরো একটা বিপদ—

প্রভাস গ্যাস দুর্ঘটনার পর থেকে আর কথা বলছে না। কোনো কিছু

ভাবতে পারছে না, রসিকতা করলে মোটে হাসছে না। অরুণ কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর চেষ্টা করেছিল কয়েকবার। অরুণের ধারণা হয়েছিল যে বিস্ফোরণের ফলে প্রভাসের হিউমার বোধ লোপ পেয়েছে। অতএব ক্রমাগত প্রভাসকে হাসির গল্প বলছিল। আইরিশম্যান, স্কচ, ইহুদী ইত্যাদিকে নিয়ে মজার মজার তিন চারটে গল্প বললাম আমরা, কিন্তু প্রভাস হাসল না। তা দেখে অরুণ বিচলিত হয়ে পড়লো। অরুণ বললো সেই গল্পটা জানিস প্রভাস, সেই যে যে-রাশিয়ানটি জার্মানের কাঁধে উঠে সমস্ত দিন বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা ব'লেছিল, উঃ এই জার্মানটি আমাকে কি ক্লান্তই না করেছে। প্রভাস গম্ভীর।

অরুণ বললো, তবে এই গল্পটি শোনো—একজন ইংরেজ ভদ্রলোক অপরিচিত এক বিশাল চেহারার ভদ্রলোককে বলছিলেন—আমাকে একজন আইরিশম্যানকে দেখিয়ে দাও, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে একজন কাপুরুষকে দেখিয়ে দেবো।

বিশাল ভদ্রলোকটি বললেন, আমি একজন আইরিশম্যান। ইংরেজ ভদ্রলোক নিজেকে দেখিয়ে বললেন, আর আমি হ'লাম একজন কাপুরুষ।

প্রভাস হাসল না। সে কোচের সামনে গিয়ে বসে পড়লো এক ভদ্র মহিলার পাশে। আমাদের সাহচর্য তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না।

কোচ চললো এগিয়ে। রোদ্দুর নেই—কিছু কুয়াসা আছে—ক্রমশ ঘন হ'চ্ছে। আমি আর অরুণ খবরের কাগজ পড়ছি। রাস্তার দুদিকে দেখবার হয়তো অনেক কিছু ছিল, কিন্তু কুয়াসায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আওয়াজ। দেখি প্রভাসের পাশের ভদ্রমহিলা প্রভাসকে চড় মেরেছেন।

অরুণ বললো, প্রভাস কি কাণ্ড করেছে! হয়তো কোনো অসভ্যতা····আমি বললাম, যাও না একটু দেখে এসো।

অরুণ গিয়েই ফিরে এলো। তার হাতে একটা আধ ইঞ্চি সদ্য-

নিহত মশা। প্রভাসের গালে ওটি বসেছিল—পাশের ভদ্রমহিলা সেটিকে মেরেছেন। এই প্রথম দেখলাম ইংল্যাণ্ডের মশা।

প্রভাসের গাল লাল।

খানিক পর আর একটা ব্যাপার ঘটলো সেটা মারাত্মক। ঘটলো প্রভাসের কপালেই। পাশের ভদ্রমহিলার একটি মাঝারি গোছের স্যুটকেস ওপরে রাখবার জায়গাতেই রাখা ছিল। ঠিক মতো বসানো হয়নি ব'লে কোচটি একটু জোরে মোড় ঘুরতেই স্যুটকেসটি প্রভাসের কপালে পড়লো, তারপরে সেটা



পড়লো তার কোলে। প্রভাসকে দেখলাম নিজের কপালে হাত বোলাতে। পাশের ভদ্রমহিলা খুবই দুঃখিত। সমস্ত পথ প্রভাস নিজের কপালে হাত বোলালো। কুয়াসা ঘন হ'তে ঘনতর হ'তে থাকলো।

আমার ঘরটি এবারে বড়। কিন্তু লোক বেড়ে গেল। আগে ছিলাম একা এক ঘরে। এখন তিনজনকে থাকতে হ'ল। মার্টিন এবং মাইকেল আমার গৃহসঙ্গী। দুজনেই আইরিশ। দুজনেরই বয়স চল্লিশের উপর—দুজনেই কাজ করে। তবে এক কারখানায় বা এক জায়গায় কাজ করে না। কখনো দেখা যায় তারা হ্যারডের দোকানে, কখনো সেলফরিজের দোকানে, কখনো বা লায়ন্সের শস্তা খাবারের দোকানে। যেখানে সুযোগ সুবিধে বেশি পেতো সেখানেই কাজ নিত। মার্টিন মোটামুটি লায়ন্সের খাবারের কারখানায় অনেকদিন কাজ করেছিল। তাকে ভোর ছটায় সেখানে যেতে হ'ত। সকাল সাড়ে চারটেয় সে ঘুম থেকে উঠতো। সকাল সাড়ে চারটের সময় ওঠা কষ্ট, লণ্ডনের মতো ঠাণ্ডা জায়গায়—সেজন্য অ্যালার্ম ঘড়ি চাই-ই। মার্টিনের ছিল সুন্দর একটি অ্যালার্ম ঘড়ি, অমন ঘড়ি সচরাচর দেখা যায় না। ঘড়িটি প্রথমে আস্তে আস্তে বাজতে থাকে কয়েক সেকেণ্ড, তারপর চুপচাপ, ক্রমে তার আওয়াজ বাড়তে থাকে। সব সমেত

হয়তো তিন চার মিনিট ধরে বাজে—আওয়াজ ক্রমশ বাড়তে থাকে। সে আওয়াজে ঘুম ভাঙবে না এমন কোনো ঘুম স্বাভাবিক ভাবে কারুর হয় কিনা জানি না। মাঝে মাঝে ঘড়ি বাজতে বাজতে নাচতে আরম্ভ করে। ঘড়ি কাঁপুনির ফলে গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায়ই কার্পেটের উপর পড়ে যায়—পড়ে গিয়েও তার বাজা থামে না। এরকম ঘড়ি কেনবার একমাত্র কারণ—মার্টিনের ঘুম একটু গাঢ়।

কিন্তু মাইকেলের ঘুম গাঢ় নয়। আমার ঘুম গাঢ় হ'লেও অমন ঘড়ির কাছে আমার জেগে থাকা সম্ভব হ'ত না। আমি এবং মাইকেল জেগে পড়তাম। মার্টিন খুব লজ্জা পেয়ে বলতো,—আরে আরে তোমরা উঠছো কেন, তোমাদের ঘড়ি এখনো বাজেনি।



মার্টিন আলো জ্বেলে দাড়ি কামাতো। রাত সাড়ে চারটের সময় আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে শুরু করতাম।

তার পর মার্টিন পোশাক পরে আলো নিবিয়ে চলে যেত। আবার ঘুম আসতো। ভোরের ঘুম।

মাইকেলের ঘড়ির অ্যালার্ম বাজতো ছ'টার সময়। মাইকেলের ঘড়িটা অত আওয়াজ করতো না—কিন্তু থেকে থেকে একঘেয়ে এমন একটা আওয়াজ করতো যা কানের মধ্যে ঢুকে অবোর আমাকে জাগিয়ে তুলতো।

মাইকেল বলতো, এবারেও বোকা ব'নে গেছ—তোমার ঘড়ি এখনো বাজেনি! আবার খানিক জাগবার পালা।

আমার ঘড়ি বাজবার কথা সাড়ে সাতটায়। কিন্তু যখন বাজতো তখন কেবল আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকতাম। মনে হ'ত নিশ্চয় এটা মার্টিনের কিংবা মাইকেলের ঘড়ি। সকালে নির্দিষ্ট সময়ে সহজে উঠতে পারতাম না। আমাকে অরুণ, প্রভাস বা ব্যানার্জিদের মধ্যে একজন জাগিয়ে দিয়ে যেতো ঘরে ঢুকে।

মাইকেল সারা সন্ধ্যে বসে বসে খবরের কাগজ পড়তো, আর পড়তো দেশ থেকে আসা চিঠি-পত্র—মার্টিন বাইরে বাইরে ঘুরতো। কখনো নাচে যেতো, কখনো বা সিনেমায়। মাইকেল খুব গোবেচারা প্রকৃতির। সে ডেইলি এক্সপ্রেস পড়তো। আমি ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান কেমন করে পড়ি, পড়ে বুঝি কিনা এসব কথা জিজ্ঞেস করতো। সে বলেছিল যে একদিন অন্য কোনো কাগজ না পেয়ে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পড়াতে তার মাথা ধরে গিয়েছিল।

আমাদের পাড়ায় সিনেমা হলে আমি প্রথমে কিছুতেই যাবো না, ভাল ফিল্ম না হ'লে দেখবো না স্থির করেছিলাম। কিন্তু একদিন মণি পালিত আমাকে কাবু করলেন। বললেন, চলো সিনেমায় যাই। আমি বললাম, না যাব না, তার চাইতে রেডিও শোনা অনেক ভালো।

গ্যাসে রোজ কত খরচ করো ? হঠাৎ প্রশ্ন করলেন মণিদা।

—তা শিলিং খানেক।

পোর্টোবেলো রোডের সিনেমা হলটিতে ন পেনি খরচ ; যতোক্ষণ খুশি বসে থাকো। সিনেমাও দেখা হয়, গ্যাসের পয়সাও বাঁচে। পোর্টোবেলো রোডের সিনেমা হলটির দিকে চোখ কখনো পড়েনি। সেটা সিনেমা হল ব'লে মনেই হ'ত না। মণিদা আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে গেলেন। হলটির নাম কেউ জানতো না—আসল নাম বোধ হয় প্রিন্স অফ ওয়েলস, লোকে বলতো ব্যাক্ হল।

ব্যাক্ হল অর্থাৎ পেছনের হল। গলির মধ্যেকার এই সিনেমা হলটিতে প্রত্যেক সপ্তাহে দু তিনবার ফিল্ম বদলায়। লণ্ডনের সমস্ত সাধারণ হলেরই শো নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হয় না। শো সাধারণত বেলা একটার কাছাকাছি কোনো সময় থেকে আরম্ভ ক'রে রাত এগারোটার কাছাকাছি সময়ে শেষ হ'য়ে যায়, এর মধ্যে একবার টিকিট কিনে সমস্ত সময় ব'সে থাকা চলে, ঘুমিয়েও থাকা চলে। অনেকেই সিনেমা হলে ঘুমুতে যায়। খারাপ হলের টিকিট তখন ছিল

ন পেনি সর্বনিম্ন। লণ্ডনের মধ্যবর্তী অঞ্চলের হলগুলিতে একটি ক'রে সিনেমা দেখায় এবং টিকিটের দামও যথেষ্ট বেশি। কতক হলের সবচেয়ে কম দামী টিকিটের দক্ষিণা পাঁচ শিলিং।

পাড়ার এই সিনেমা হলটিতে যেতো পাড়ার সমস্ত লোক। ছোটরা যেত দুঃসাহসিক অবিশ্বাস্য কাহিনী একাগ্র মনে দেখতে। অধিকাংশই মার্কিন ছবি। কিন্তু খারাপ ছবি ইংরেজরাও যথেষ্ট তৈরি করে। ইচ্ছে ক'রেই করে। কারণ খারাপ ছবি—অর্থাৎ গতানুগতিক কল্পনাবিহীন বেপরোয়া অ্যাডভেঞ্চার ছবি দেখবার কিছু জায়গা এবং কিছু লোক সব দেশেই আছে। সে ছবির গল্পের সঙ্গে বাস্তবতার কিছুমাত্র মিল নেই। সবচেয়ে বেশি তারা দেখে আনন্দ পায় কেমন করে মানুষদের খুন করা হয়। বিশেষত রেড ইণ্ডিয়ান বা কালো লোকদের খুন ক'রবার দৃশ্যের সময় ছোটরা উত্তেজিত হ'য়ে চ্যাচাতে থাকে। এই রকম ফিল্ম দেখানোর ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নাকি অপরাধ প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। চৌদ্দ বছর এবং সতরো বছর বয়সের দুটি ছেলে—বেণ্টলি এবং ক্রেগ—একটি পুলিসকে রিভলভার দিয়ে মেরে ফেলেছিল প্রায় বিনা কারণে, তার মূলেও নাকি এই ধরনের সিনেমা। আজকাল যে কিছু কিছু কালো লোকদের উপর অত্যাচার করা হ'য়েছে কেউ কেউ বলেন সেগুলি কুরুচিপূর্ণ জাতিদ্বেষ প্রচারমূলক ছবি দেখার প্রত্যক্ষ ফল। এ ছাড়া অবশ্য অন্য অনেক কারণ আছে। অর্থ নৈতিক অবস্থা সমস্ত রাজনৈতিক এবং জাতিগত লাঠালাঠি খুনোখুনির মূলে অবশ্যই—সিনেমা ইত্যাদি কেবল খুনোখুনিতে সাহায্য করে মাত্র।

পুরোপুরি অ্যাডভেঞ্চারের ছবির অসম্ভাব্যতা না দেখলে বোঝানো সম্ভব নয়। এসব ছবিতে প্রতি দু'মিনিটের মধ্যে কবার করে লড়াই দেখানো হয়, কত চেয়ার যে মাথায় ভাঙা হয় নায়কের তার ইয়ত্তা নেই! অথচ এত শক্ত সে মাথা যে কখনো ভাঙে না। নায়ক কয়েক মুহূর্ত বা মিনিট অজ্ঞান হয়ে থাকে বটে কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে উঠে সে

আগেকার মতোই হৈ-চৈ করতে থাকে। বোমার আঘাতেও এসব নায়কের কিচ্ছু হয় না। এরকম একটি বোমা সেন্সর বোর্ড কেমন করে পাস করান বোঝা শক্ত। ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে বোমা ফেলা, লোক খুন করা নিত্য-নৈমিত্তিক এবং অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলে মনে হয়। এই সমস্ত সিনেমা দেখার সময় তারা সিগারেট টানতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

সিনেমায় যে সমস্ত লোক খারাপ—তারা অ্যামেরিকান বা বৃটিশ নয়। তারা হয় চীনে, আফ্রিকান, রেড ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় বা রাশিয়ান। তাদের মুখ ভাবলেশহীন, তারা যে কোনো রকম অপরাধ ক'রে বেড়ায়। তাদের নাম থেকেই তাদের পরিচয়। ভারতীয়দের নাম হয় রাম সিং জাতীয়, আর রাশিয়ানদের বোঝাতে গিয়ে যে কোনো নামের সঙ্গে 'স্কি' যোগ ক'রে দেওয়া হয়! জার্মান ইটালিয়ানরাও মাঝে মাঝে এই সব সিনেমায় খুনে হিসেবে দেখা দেয়, কিন্তু ফরাসীরা কখনো কাউকে খুন করে না—ফরাসীরা বড় জোর গুপ্তচর পর্যন্ত হয়। বিদেশীদের বিরুদ্ধে কথা বলা সব জাতেরই অভ্যাস। নিশ্চিত মনে বলা যায় বলেই সেগুলো বলা হয়। কেউ বাধা না দিলে সেগুলো আস্তে আস্তে লোকে বিশ্বাসও করতে থাকে।

অধিকাংশ লণ্ডনের (এবং ইংল্যাণ্ডের) সিনেমা-হলেই খারাপ ছবি দেখানো হয়। কারণ সেগুলি বেশি তোলা হয়। সেগুলি তুলতে খরচ কম হয়, ডিরেক্টরের কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না—যত কম কল্পনাশক্তি থাকে, ততই ভালো (আমাদের অধিকাংশ হিন্দী ছবির সঙ্গে তুলনীয়)। ভাল অভিনেতার প্রয়োজন হয় না, মোটামুটি একটি মুভি ক্যামেরা, দু-চারটি ঘোড়া এবং কিছু লোক আর পিস্তল, এ হ'লেই ছবি তোলা সম্ভব। অথচ বৃটেনে মোটামুটি ভালো ছবি—কখনো কখনো অতি আশ্চর্য ভাল ছবিও, তোলা হয়েছে। কিন্তু তাতে বৃটেনের ছবির সর্বজনীন উন্নতি হয়নি। অড ম্যান আউট, একটি ভালো বৃটিশ ছবি—গম্ভীর নাটকীয় পরিস্থিতির স্বাভাবিক সমন্বয়। আইরিশ

বিপ্লবীদের জীবন নিয়ে বাস্তব ছবি। ক্যারল রীডের দি ফলেন্ এঞ্জেলও আর একটি ভাল ছবি। ঈলিং স্টুডিও সম্ভবত বৃটেনের সবচেয়ে বেশি ভাল ছবি তুলেছে যুদ্ধের পর। এদের সুন্দর সহজ হিউমারবোধ প্রায় প্রতিটি ছবির রস বাড়িয়েছে। পাসপোর্ট টু পিমলিকোর মতো ছবি বৃটিশ চরিত্রকে যতখানি ফুটিয়ে তুলেছে, অন্য আর কোনো সাম্প্রতিক ছবিতে তা ফুটেছে বলে আমার জানা নেই। অথবা স্কচদের সম্পর্কে 'হুইস্কি গ্যালোর' ছবিখানা। বৃটেনের ইতিহাসে নাটকের স্থান খুব উঁচুতে। এখনো লণ্ডনের স্থান পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট—যদিও নিউ ইয়র্ক প্রতিযোগিতায় প্রায়ই ছাড়িয়ে যাচ্ছে জনপ্রিয়তায়। এই নাটকের নাটকীয়ত্ব থেকে সিনেমার স্বাভাবিকত্বে এখনো তারা পুরোপুরি আসেনি—অ্যামেরিকাতে যেমন এসেছে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে।

সিনেমার জনপ্রিয়তা বৃটেনে কমছে। এর নানা কারণ আছে অবশ্য। প্রথমত সিনেমা নতুন পথের সন্ধান করছে না। সমস্তই পুরোনো এবং পুনরাবৃত্তি। হঠাৎ দু-একটি ভালো ফিল্ম সমস্ত দর্শককে সমস্ত সময়ের জন্য টানতে পারে না। এটি একটি কারণ—দ্বিতীয় কারণ হ'ল টেলিভিশনের প্রসার। তৃতীয় কারণ হ'ল—ক্রমশ সিনেমার টিকিটের দাম বাড়ছে। কারণ সিনেমা কর্মচারীদের মাইনে দেবার মতো টাকা জুটছে না স্বাভাবিক ভাবে অথচ দাম বাড়ানোতে লোক আরো কম যাচ্ছে। প্রচুর হল বন্ধও করে দিয়েছে। এখনো বন্ধ হচ্ছে।

ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে বড়দিনের জন্য নানা রকম তোড়জোড় চলছিল। সমস্ত বৃটেনেই তোড়জোড় চলে। আমাদের দুর্গাপূজোর সঙ্গে অনেকে তুলনা করেন এই উৎসবের, কিন্তু পুরোপুরি মিল নেই। এত বড় উৎসব, কিন্তু লণ্ডনের দুটি স্থান—ট্রাফালগার স্কয়ার এবং পিকাডিলি সার্কাস ছাড়া প্রকাশ্য স্থানে হৈ-হুল্লোড় একেবারে নেই। ওখানে প্রত্যেকের কানের দু ফুট দূরে ঢাক বাজানো হয় না। লাউড স্পীকারে হিন্দী ফিল্মের গানও শোনানো হয় না। ব্যক্তিগত ভাবে বাড়িতে পাড়ার লোককে একেবারেই না জানিয়ে পার্টি চলে। সেখানে নানা

রকম হৈ-চৈও চলে, কিন্তু রাস্তায় তারা পদে পদে খুঁটি পুঁতে প্যাণ্ডাল বসায় না। ফুটপাথ জুড়ে 'কুসমাস টি্' বসায় না। জড়বাদের চূড়ান্ত।

বড়দিনের আগে মণিদা বললেন, এবারে শুরু হ'ল কার্ড দেওয়া নেওয়ার পালা। প্রচুর কার্ড কিনতে হবে। এই সময় দোকানে দোকানে বড়দিনের কার্ড পাওয়া যায়—হরেক রকম। আমি সবে (১৯৫১) গেছি লণ্ডনে ; খুব কম লোককেই চিনি—তবু হিসেব করে দেখলাম আঠারোটি কার্ড কিনতেই হবে। কার্ড পাঠানোটা অনেকটা আমাদের দেশের বিজয়ার প্রণামের বা আশীর্বাদের মত। এর যেমন ভাল দিক আছে তেমনি ঠাণ্ডা যান্ত্রিক দিকও আছে। কার্ড পাঠাতে হয় অতএব পাঠাচ্ছি—পাঠাতে যে সব সময় আনন্দ হয় তা নয়! কিন্তু কেবল কার্ডই নয়। মেজো ব্যানার্জি বললেন, শেরী বা পোর্ট বা অন্য কোনো ওয়াইন দিলে ভালো হয়। আমরা সবাই মিলে দিলে দাম কম পড়বে। কিন্তু তাতেই সমস্যা মিটবে না—মিসেস ম্যাথার্সকে ওয়াইন দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু মিস্টার ম্যাথার্স ? একটা পাইপ —না টাই ? শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল টাই এবং রুমাল। তাছাড়া বার্নাডেট ? বার্নাডেটকে তো কিছু দেওয়া চাই।



বার্নাডেট মিসেস ম্যাথার্সের বোনের মেয়ে। বয়স সতেরো ওজন সতেরো স্টোন। বাড়িতে থেকে শর্টহ্যাণ্ড শেখে—সেক্রেটারি হবে সে। আমাদের মাঝে মাঝে সে টেবিলে ডিনার দিয়ে যেতো। ওকে দেওয়া হবে একটা শিফন স্কার্ফ, বার্নাডেটের ছোট ভাই জর্জ, তার জন্যে একটা টাই।

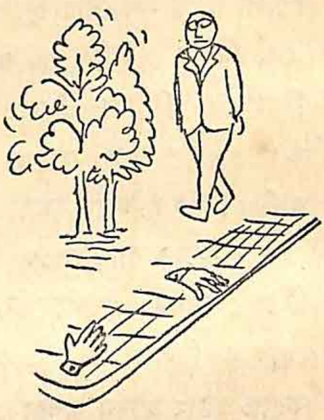
বাড়িতে হঠাৎ চা পাওয়া যেতো না। রান্নাঘরে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। জীবন লোকুড় তো ভয়ানক খাপ্পা—একদিন বল্‌লো বাড়িতেই চা-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরেই গ্যাস রিং আছে অর্থাৎ দাড়ি কামানোর জল গরম করবার জন্য ছোট্ট একটা

গ্যাসের উনুন। শোয়ার ঘরেই এক কোণে পড়ে থাকে। সেটার ব্যবহার চাই। আর চাই কেটলি, টীপট, কাপ ডিশ, চিনি, চা চামচ—। মণিদা বললেন উত্তম প্রস্তাব—চাঁদা তোলা হ'ক। পাঁচ শিলিং ক'রে হল বোধ হয় পঁয়ত্রিশ শিলিং। সে টাকা নিয়ে আমি এবং নিশীথ মুখার্জি একদিন বাজারে বেরিয়েছিলাম সমস্ত জিনিস কিনতে। জিনিস কিনেওছিলাম, কিন্তু কোনোদিন চা খাওয়া হয়নি। আমার হাতে ছিল কাপের প্যাকেট ; ল্যাডব্রোক স্টেশন থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটবার সময় প্যাকেটটির দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায় রাস্তায়।

আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইলের ভেতর ছিল নটিং-হিল গেট টিউব স্টেশন। সেখানে সমস্ত রাত খুলে রাখে এমন একটি চায়ের দোকান ছিল। রাত একটা পর্যন্ত মণিদার ঘরে গল্পগুজব করতে করতে হঠাৎ জীবন অথবা নিশীথ বলতো, চল যাই চা খেয়ে আসি। কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে আমরা নেহাত নতুনত্বের জন্যেই অতখানি পথ হাঁটতাম। সেখানে গিয়ে এক কাপ ক'রে জঘন্য বিস্বাদ চা খেয়ে আবার ফিরে আসতাম। এ রকম অবশ্য বেশীর ভাগ শনিবারেই হ'ত।

লণ্ডনে যতই শীতের মাসগুলি আসতে লাগলো, আর যেতে লাগলো, নবেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ইত্যাদি আমরা হতাশ হ'য়ে পড়তে লাগলাম। কই তেমন ঠাণ্ডা কোথায় ? আমরা নানা রকম গরম হবার পোশাক সঙ্গে রেখেছিলাম—কিন্তু সেগুলো সব প্রয়োজন হ'ল না। দস্তানা হাতে পরবার কোনো প্রয়োজন হ'ল না। এমন কি, যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ছে না বলে কেমন খারাপও লাগতে লাগলো। কেউ কেউ তবু দস্তানা পরতে লাগলো এবং হারাতে লাগলো। দস্তানা ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে কোনো কাজে লাগে না। অনেকে শখ ক'রে নরম চামড়ার দস্তানা কেনেন হাত গরম হবে ব'লে, কিন্তু দস্তানা নিয়ে নানা রকম ভাবে বিব্রত হ'তে হয়। দস্তানা পরলে সে হাত দিয়ে সমস্ত রকমের কাজ করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। জামার বোতাম লাগানো, টাই পরা, চিঠিখোলা, সিগারেট ধরানো এগুলি প্রায় অসম্ভব। তা

ছাড়া পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলে বেজায় অসুবিধে। তাই দিনের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ বার দস্তানা খোলা আর পরা এই নিয়েই থাকতে হয়। প্রতি বার দস্তানা খুলে আবার যত্ন ক'রে কোটের বা জ্যাকেটের পকেটে রাখতে হয়। এত বেশি দস্তানা লণ্ডনে হারায় যে অত দাম দিয়ে কেনবার কোনো অর্থ হয় না।



মণি পালিত বলতেন, যদি দস্তানা কিনতেই হয় তবে বাপু তিন শিলিং-এর উলওয়ার্থের দস্তানা কেনাই সুবিধের—তাতে অবশ্য ছত্রিশ শিলিং দামের দস্তানার মতো ঠাণ্ডা আটকায় না, এমন কি সেগুলো পরাও যা, না পরাও প্রায় তাই—কিন্তু তবু কম পয়সার উপর দিয়ে যায়। লণ্ডনের পথে চলতে চলতে দস্তানা রাস্তায় পড়ে থাকার দৃশ্য অতি সাধারণ ঘটনা। কেউ এক মাসের মধ্যে একবারও দস্তানা না হারালে তার প্রতি লোকেরা সন্দেহের চোখে দেখে। যে লোক এত সাবধান দস্তানা সম্পর্কে, সে হয় বেজায় কৃপণ নয় তো মিথ্যেবাদী। এ রকম লোকেদের সংসর্গ লোকে এড়িয়ে চলে।

লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় কত দস্তানা পড়ে থাকতে দেখেছি তার সীমা-সংখ্যা নেই। ঘন উলের ছোটদের দস্তানা, সাদা, লাল এবং অন্যান্য রঙের। ছোট ছোট দস্তানা, তারপর আরো বড় দস্তানা। দস্তানার আকার যত বড় হয় তার রঙ হয় তত সাধারণ, ছাইরঙা দস্তানাই বেশি। একেবারে কালো রঙের দস্তানা সাধারণত মেয়েদের জন্য। একদিন আমাদের বুড়ো ব্যানার্জি বললেন (সব চেয়ে বড় ব্যানার্জির বয়স ত্রিশ—কিন্তু তাঁকেই বুড়ো বলে ডাকা হত।) এদেশে দস্তানার ব্যবসা খুব লাভজনক। লোকে এত হারায়! শুনে প্রভাস বললো, বহু লোক তেমনি আবার দস্তানা কেনেই না মোটে। রাস্তা

থেকে কুড়িয়ে অনেকেই দস্তানা পরে। তাই দেখা যায় বহু লোককে, দু' হাতে দু'রকম দস্তানা। তারপর প্রভাস বললো, দস্তানাজোড়া খুব সাবধানে রাখতে হবে—হারিয়ে না যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাই প্রভাস দস্তানা জোড়াটি হারিয়ে এলো ল্যাডব্রোক গ্রোভ স্টেশনে।

আর একটি জিনিস খুব হারায় সে হল ছাতা। লণ্ডনের তো আবহাওয়ার স্থিরতা নেই—সকালে ভয়ানক বৃষ্টি হয় তো, বেলা বারোটায় বদলে গেল দৃশ্য একেবারে—রোদ্দুরে ভ'রে গেল সমস্ত শহর। ছাতা রোদ্দুরে কেউ মাথায় দেয় না—অতএব বাস থেকে নামবার সময় ছাতা নিয়ে নামতে ভুল হয়ে যায়—রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে ছাতার কথা মনে পড়ে না। বেকার স্ট্রীটের রেলোয়ে লস্ট প্রপার্টি অফিসে হাজার হাজার ছাতা গেলেই চোখে পড়বে।

ছাতা আমরা কেউ ব্যবহার করিনি কখনো। টুপিও না। ভারতীয় ছাত্ররা এসব ব্যাপারে খুব সহজ। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা লণ্ডনে এসে দুঃখ পায় শীতকালে একটি জিনিসের অভাবে—সে হল তুষার!

কোথায় তুষার?

বড়দিনেও তুষার পড়েনি। জানুয়ারী গেল, ফেব্রুয়ারী গেল, তুষারের কোনো চিহ্ন নেই। একদিন পড়েছিল আধ মিনিটের জন্য—ছোট ছোট টুকরো। কিন্তু সে তো নেহাত ফাঁকি।

মণি পালিত বললেন, লণ্ডনে স্নো বিশেষ পড়ে না। কোনো কোনো বছর একেবারেই পড়ে না। শুনে মন খারাপ হ'য়ে গেল আমাদের। স্নো দেখতে পাব না লণ্ডনে? সেই যে পড়েছিলাম রবার্ট ব্রিজেসের কবিতা:

All night it fell, and when full inches seven
It lay in the depth of its uncompacted lightness.

এপ্রিল মাসেও স্নো পড়বে না ব'লে মনে হল। বসন্ত এসে গেল। ড্যাফোডিল ফুলেরা হৈ চৈ করে জেগে উঠলো শীতে শক্ত হয়ে যাওয়া

জমিকে ভেঙে ফেলে। প্রাচীনের দেয়াল নবীনের প্রাণোচ্ছ্বাস দিল ভেঙে। শীতবুড়োর মৃত্যু হ'ল ড্যাফোডিলের ছোঁয়ায়। ড্যাফোডিল আহ্বান করল আরো অগণিত ফুল এবং ফলকে। ঘাসের রঙ হল সবুজ।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য! শীতের পত্রহীন গাছেদের দল—হঠাৎ শুরু করে দিল নতুন পাতা গজানোর কাজ। এত তাড়াতাড়ি গাছগুলো পাতায় ভরে যায় যে হঠাৎ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ওরা ওভারটাইম খাটে সম্ভবত। লণ্ডনে বসন্ত এসে গেল। "টাইমস" দৈনিক খবরের কাগজে একটি পত্রলেখক লিখলেন, 'আমি কোকিলের ডাক শুনেছি—এ বছরের প্রথম কোকিল সম্ভবত।'

বসন্ত যখন একেবারে জেঁকে বসেছে—এপ্রিল মাসের প্রায় শেষ—এমনি সময় একদিন হঠাৎ শুরু হল তুষারপাত। আশ্চর্য করে দিল আমাদের। এমন আশ্চর্য হবার কোনো কথা নয় অবশ্য। কিছুদিন আগেই পড়েছিলাম একজন অ্যামেরিকান কমেডিয়ানের মন্তব্য, "ইংল্যাণ্ডে আমি চার ঋতু কাটিয়েছি। আমি পেয়েছি বসন্তের হাওয়া, গ্রীষ্মের সূর্য, শরতের শান্ততা এবং শীতের ঠাণ্ডা এবং তুষার।" খানিক থেমে বলেছিলেন, "অবশ্য এ সমস্ত একদিনের মধ্যেই ঘটেছে।"

তুষারপাতের ছুটো দিক আছে। একটি ঘরের মধ্যে থেকে বাইরে তাকানো। এমন সুন্দর দৃশ্য আর দেখা যায় না। সমস্ত সাদা—উজ্জ্বল সাদা। গাছের পাতা আর দেখা যায় না—হালকা তুষার ঢেকে দিয়েছে। এমন স্বর্গীয় মনে হয়! কিন্তু তুষারের ফলে রাস্তা অচল হয়। মোটর গাড়ির ছুর্ঘটনা বেড়ে যায়। বাস আস্তে চলে। অনেক সময় ট্রেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেমে থাকে তুষার জমে থাকার জন্য। পাড়াগাঁয়ে বিশেষ ক'রে কত ফুট যে জমে যায় তুষার, অনেক সময়ে এমন হয় যে, কতক কতক অঞ্চল তুষারের ফলে বেশ কয়েক দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। তখন এরোপ্লেনে ক'রে সে সব জায়গায় খাদ্য ফেলে আসা

হয়। তা ছাড়া কাদা জমে। তুষার গলছে না—লোকেরা তুষারের উপর দিয়ে যাচ্ছে, ধুলো আর তুষার মিলে কাদার সৃষ্টি হয়। জুতো ভালো জাতের না হ'লে পায়ে ঠাণ্ডা লাগে বেশ, আমাদের দেশের অনেক জুতোই তুষারে অচল।

আমাদের পাড়ায় একটি স্ন্যাক্ বার (Snack Bar) ছিল। মাত্র একটিই আমাদের পাড়ায় ছিল। সে দোকানে দু পেনি দামের চা এবং তিন পেনি দামের সসেজ রোল পাওয়া যেতো। এই দোকান খুলতো সকাল ছটায়, রাত প্রায় সাড়ে দশটা খোলা থাকতো। এর কাছেই একটি সিনেমা আর আমাদের বিখ্যাত টিউব স্টেশন—ল্যাডব্রোক গ্রোভ। এই স্ন্যাক্ বারটিতে প্রায় সমস্ত সময়ে লোকের ভিড় লেগে থাকতো—যদিও জায়গার পরিমাণ ছিল নেহাতই কম। এই দোকানে রাত আটটা পর্যন্ত সিগারেটও পাওয়া যেত। রাত আটটার পর কিনতে গেলে অন্তত এক কাপ চা খেতেই হ'ত। ইংল্যাণ্ডে যে কেউ ইচ্ছে মতো সিগারেট বেচতে পারে না—যখন তখন তো নয়ই। আর আমি যখনকার কথা বলছি, তখন ইচ্ছে মতো ব্র্যাণ্ডও পাওয়া যেত না। প্লেয়ার্স সিগারেট অনেকেই পছন্দ করত কিন্তু দোকানদারের কাছে সমস্ত সময় তা পাওয়া যেত না—কেবলমাত্র মণি পালিত বরাবর প্লেয়ার্স সিগারেট কিনতেন। তিনি বলতেন, কৌশল জানা প্রয়োজন। কিন্তু কি সে কৌশল, তা কখনো প্রকাশ করতেন না।

আমাদের মণিদা খুব হিসেব ক'রে চলতেন। এই সময় লণ্ডন ট্রানস্‌পোর্ট সিদ্ধান্ত করলো ভাড়া বাড়াবে কোনো কোনো টিকিটের। টিউবের সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক টিকিট পাওয়া যায়। ত্রৈমাসিক টিকিট কেনাটা সবচেয়ে লাভজনক। মণিদা বরাবরই সাপ্তাহিক টিকিট কিনতেন, কিন্তু ভাড়া বেড়ে যাবার আগের দিন একেবারে তিন মাসের টিকিট কিনে ফেললেন। সবাইকে বললেন কথাটা। সবাই মণিদার বুদ্ধিতে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। কিন্তু হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল।

মণিদার টিকিট ছিল পিকাডিলি পর্যন্ত। ভাড়া সাড়ে ছ পেনি (দূরত্ব তিন মাইলের কাছাকাছি) কিন্তু সেবারে লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট যেমন ভাড়া বাড়িয়েছিল—দেড় পেনির টিকিট দু পেনি হ'য়েছিল, আড়াই পেনির টিকিট তিন পেনি হয়েছিল, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সাড়ে ছ পেনির টিকিটের দাম বাড়ানো হয়নি, কমিয়ে ছ পেনি করা হয়েছিল। মণিদা, আমাদের যতদূর ধারণা ঐ একবারই ঠকেছিলেন।

রোজ একরকম খাদ্য খেতাম; বিকেলে হাইড পার্কে যেতাম শনি রবিবার, চারদিন সন্ধ্যেবেলা স্কুলে যেতাম, আর সপ্তাহে একদিন কেবল সময় পাওয়া যেত যা ইচ্ছে করবার। আমরা সেদিন সিনেমা দেখতাম।

এই সময়কার ডায়েরী থেকে একটি রবিবারের ঘটনা তুলে দিচ্ছি। তারিখ ১৮ই মে, ১৯৫২ সাল:

"সকালে বেশ দেরি হ'ল ঘুম ভাঙতে। সেই পুরোনো সকাল—আর সেই পুরোনো ব্রেকফাস্ট—ডিম, টোস্ট আর কর্নফ্লেকের সঙ্গে খানিক দুধ, তারপর চা—চিনিহীন। মাসে দু পাউণ্ড বরাদ্দের একটু চিনিও অবশিষ্ট আর নেই—বহুদিন হল তা ফুরিয়েছে, আর সাতদিনের আগে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। খবরের কাগজ আসেনি। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন রবিবারে বেরোয় না। টেবিলে আজ মিঃ সালিকের সঙ্গে আলাপ হল, এদেশে এসেছে অর্থনীতি পড়তে। আজ সে কোথাও বেরোবে না। আজকের এমন চমৎকার রোদ তার মন ভোলাবে না একটুও।

"নিশীথের ঘরে গেলাম—সে তখনও ঘুমুচ্ছিল। ওকে ডেকে তুলে রাজনীতি আলোচনা করলাম—আর আলোচনা করলাম—বাইরের রোদ্দুর সম্পর্কে। গত পনেরো দিন স্নান করা হয়নি, অতএব চট করে স্নান করে নিলাম। গ্যাস মিটারে পাঁচটি ফেললাম, এবং খুব সাবধানে পাইলট লাইটটি জ্বাললাম। কারণ আমাদের গ্যাসের কলটিতে ত্রুটি আছে আর প্রায়ই বিস্ফোরণ হয়।

"লাঞ্চ খেলাম বেলা একটায়। সেই সাধারণত যা খাই একই

প্রেসড বীফ, আলু সেদ্ধ আর অল্প চারটে ভাত—এ ছাড়া টেবিলে রুটি আর মার্গারিনও ছিল। খাবারের স্বাদ খুব খারাপ—নেহাত বেজায় খিদে পেয়েছিল বলেই খেতে পারলাম। তবে খাবার খেতে খারাপ হলেও এর মধ্যে খাবারের সমস্ত গুণই ছিল—তাই আর সে নিয়ে বিশেষ অভিযোগ করলাম না।

"অ্যাটম বোমা সম্পর্কে একটি অ্যামেরিকান পুস্তিকা পড়তে শুরু করলাম লাঞ্চের পর—তারপর Picture Post-এর একটি প্রবন্ধ পড়লাম হরোর কমিক সম্পর্কে বেশ সুন্দর লেখাটি। এর পরে ঘুম এসেই যেত যদি না কানুনগো এসে আমাকে ডেকে তুলতো। ও বললো হাইড পার্কে গিয়ে ওখানকার সার্পেন্টাইনে একটি বোট ভাড়া করে ঘোরা যাক। রাজী হয়ে গেলাম।

"অরুণকেও সঙ্গে নিলাম। সবাই মিলে মার্বল আর্চ টিউব স্টেশনে নেমে মাটির তলাকার রাস্তা দিয়ে হাইড পার্কে এসে ঢুকলাম। পার্কে প্রচুর লোকজন। গত ফেব্রুয়ারীতে রাজার মৃত্যুর সময় ছাড়া এত ভিড় হাইড পার্কে আর দেখিনি।

"নানারকম লোক বক্তৃতা দিচ্ছিল, আর এক এক দল সেসব বক্তৃতা শুনছিল। বক্তৃতা কতরকমই না—রাজনৈতিক, ধর্মসম্পর্কীয় এবং আরো কত। লোকেরা বক্তৃতা শুনছিল সোশ্যালিস্টদের, কমিউনিস্টদের এবং ফাসিস্তদের। তারা শুনছিল কালো লোকদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বক্তৃতা। তা ছাড়া ছিল অ্যানার্কিস্টরা। এই সমস্ত বক্তৃতা হচ্ছে—আবার এদের কাছাকাছি কিছু কম বয়সী ছেলেমেয়েরা ক্রমাগতই গান করছিল। তাদের গানের মধ্যে কোনো ধর্মভাব বা রাজনৈতিক ভাব ছিল না—কেবলই আনন্দের জন্য সেগুলি তারা গাইছিল।

"আমরা ওদের অতিক্রম করে চললাম। কানুনগো আমাদের কিছুতেই সেখানে থাকতে দিল না—সে কেবলই বলতে লাগলো একটা বোট ভাড়া করা চাই আজ। আমরা মাঠ পেরিয়ে চললাম বোটের

দিকে। মাঠে কত লোক শুয়ে বা বসে—আর ছোটয়া কেউ খেলছে, কেউবা বা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে—অনেকটা কোলকাতার ঘুড়ির মতো—তবে হাইড পার্কের ঘুড়িগুলোতে ল্যাজ লাগানো।

"সার্পেণ্টাইনে পৌছলাম। লম্বা একটা লেক, বালীগঞ্জের লেকের চাইতে ছোট। প্রচুর বোট তাতে এক, দুই, তিন এবং চার জনকে বসে থাকতে দেখলাম। একটি বোটও পেলাম না আমরা। বিরাট কিউ হয়েছে বোট নেবার জন্য। অরুণ বললো, আমাদের আগেই আসা উচিত ছিল। কানুনগো বললো, সে আগেই জানতো এমনটি হবে। কিন্তু সে আগে বলেনি সে সম্পর্কে একটি কথা। সমস্যা হল, করি কি?

"অরুণ বললো সিনেমায় গেলে হয়। কানুনগো বললো হাইড পার্কে হাঁটা বা দৌড়ানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। আমি বললাম চলো পার্কের বক্তৃতা শুনিগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরুণের জিত হ'ল। আমরা শস্তা একটি সিনেমা হল খুঁজে বার করলাম আর খুব খারাপ দুটি ফিল্ম দেখে বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।"

হাইড পার্কের বক্তৃতা শুনলে আশ্চর্য হ'য়ে যেতে হয় একটি জাত কতখানি পরমতসহিষ্ণু হ'তে পারে। একজন লোক কতখানি স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে। অবশ্য হাইড পার্কের ইতিহাস বরাবর শান্তিপূর্ণ ছিল না। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শোভাযাত্রাকারীদের উপর পুলিস গুলী চালায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেই শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন উইলিয়ম মরিস। এই শোভাযাত্রায় ছিলেন তরুণ বার্নাড শ'। গুলীর আওয়াজ হতেই বার্নাড শ' দৌড়ে পালাচ্ছিলেন। এক বন্ধু বললেন, কাপুরুষ! তুমি পালাচ্ছ? বার্নাড শ' উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ পালাচ্ছি, চিরকালের মতো মরে থাকার চাইতে একবারের জন্য কাপুরুষ হওয়া অনেক ভালো। এই হাইড পার্কে শুনলাম আমাদের পরিচিত একটি ছেলে কিছুদিন আগে বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিল। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু সবাই মজা করে

হাততালি দিয়েছিল এই ছেলেটি ব্যারিস্টারী পড়ত, তাই যাতে সে ভাল বক্তৃতা দিতে পারে ঘাবড়ে না গিয়ে সেজন্য মাঝে মাঝে



হাইড পার্কে এসে বক্তৃতা দিত। কোনদিন বাংলায় ইংরেজদের গালাগাল করতো— এমন হাসি হাসি মুখ ক'রে যেন সে খুব মজার কথা বলছে। সে বলতো, জোচ্চোর, মূর্খ তোমরা সব—শালা বদমাশ, তোমাদের দেশ কচুরও অধম। একদিন একজন বয়স্ক ইংরেজ বক্তৃতার পর আমাদের বন্ধুকে বললো, ভাই আমি তোমার একজন ভক্ত হয়ে পড়েছি, তোমাকে আমি বীয়ার খাওয়াবো। আমাদের বন্ধু বলছিল, আপনার ভুল হয়েছে—আমি এক ঘণ্টা কেবল ইংরেজদের গালাগাল করেছি। ইংরেজটি বললেন, তা জানি। কারণ আমি বাঙলা জানি। প্রায় ত্রিশ বছর কোলকাতায় ছিলাম। ইংরেজদের প্রতি তোমাদের রাগের কারণ আমি বুঝি।

বাংলা-জানা ইংরেজ আমরা কিছু কিছুর সন্ধান পেয়েছি, সমস্ত সময়েই অপ্রত্যাশিত ভাবে। মাঝে মাঝে খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। একদিন আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে চেপস্টাও রোডের কাছেকার রক্সি সিনেমার বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি, আমি, অরুণ পালিত এবং প্রশান্ত ঠাকুর। এমন সময় তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। বাংলা-জানা এক সাহেব, নাম গুডহ্যাম। নামটা বাংলায় অনুবাদ করলেন—ভালো শুয়োর। বললেন তাঁকে বাংলায় ভালো শুয়োর বলে ডাকতে। হ্যাম মানে অবশ্য শুয়োর নয়।

ভালো শুয়োরের বয়স ষাটের উপর। তাঁর কাহিনী বিরাট, বিশাল। একটি উপন্যাস তৈরি হতে পারে। আসামে এবং বাংলা দেশে মেডিক্যাল সার্ভিসে ছিলেন। বহুদিন অবসর গ্রহণ করেছেন, এখনও পেন্সন পান—তাতে চলে না ভালো। পিয়ানো শেখান লোকদের আর কুকুরের দৌড়ের বাজি ধরেন। তাতে তাঁর খুব কমই

হার হয়। তাঁর কুকুরের দৌড়ের একটি সিস্টেম আছে—তাতে হারা নাকি সম্ভব নয়। প্রশান্ত এবং অরুণ সম্ভবত মিস্টার গুডহ্যামের সঙ্গে দেখা করেছিল। আমি আর যেতে পারিনি।

এক রবিবারে সকালে তুমুল তর্ক চলেছে ব্রেকফাস্ট টেবিলে। ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে। আমাদের বাড়িতে প্রচুর রাজনীতিতে উৎসাহী ছেলে থাকতো। একদিন দেখি ওয়ারড্রোবের উপরে একগাদা পোস্টার—তাতে সাইক্লস্টাইল করে বাংলায় লেখা ; টেড ব্র্যামলিকে ভোট দিন। একজন বুঝিয়ে দিল গত নির্বাচনের সময় ওগুলো ছাপানো হ'য়েছিল। কিন্তু বাংলায় কেন? শুনলাম কেবল বাংলায় নয়, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষাতেই সেগুলি করা হ'য়েছিল এবং ডক অঞ্চলে বিলি করা হয়েছিল। ডক অঞ্চলে অনেক ভারতীয়ের বাস। যাই হোক আমাদের টেবিলে সমস্ত সময়ের হিসেব নিলে দেখা যেত শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সময় রাজনীতি আলোচনা হত। এই রাজনীতি আলোচনা মণিদা বিশেষ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, রাজনীতি করতে চাও করো, কিন্তু খাবার সময় চেঁচিও না। অন্য কেউ ওরকম উপদেশে কর্ণপাত করত না। তর্ক চলতো। মাঝে মাঝে তর্ক অবশ্য থামতো! একদিন যেমন থেমেছিল।

ভয়ানক তর্কের মাঝে হঠাৎ জীবন লোকুড়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল—গামছা! গামছা প'রে লণ্ডনে? মণিদা বললেন, হুঁ, তাই তো বলছি। আমার পরিচিত হরিপদবাবু এলেন লণ্ডনে, এক মাঝারি হোটেলে। সকালে উঠে ঠাণ্ডা জলে চান করা অভ্যেস। চানের ঘর থেকে গামছা পরে নিজের ঘরে আসছিলেন—এই লণ্ডনেও। লণ্ডনে প্রথমতো



কেউ চান করে না, চান করলেও ঠাণ্ডা জলে কেউ চান করে না।

একথার পর রাজনৈতিক আলোচনা স্তব্ধ। সবাই শুনতে লাগলো অধীর আগ্রহে; তখন সকাল সাড়ে ছটা সাতটা হবে। একটি পরিচারিকা ঘরে চা নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল গামছাপরা হরিপদবাবুকে! হরিপদবাবু বেঁটে, মোটা এবং কালো। তার সঙ্গে লাল গামছা! অপরূপ সমন্বয়। পরিচারিকার প্রথমে হাত কাঁপতে থাকে। তারপর গা, তারপর সমস্ত ট্রে সমেত চায়ের সরঞ্জাম গড়িয়ে পড়ে। পরিচারিকা পরে বলে সে ভূত দেখেছিল!

উপরের ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল কি না জানি না। তবে আমাদের রাড়িতেই একটা 'ভূত দেখা' ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন আমাদের বাড়িতে নতুন দুটি ছেলে এসেছে—একজন আবার ব্যানার্জি। সে হ'ল আমাদের চার নম্বর ব্যানার্জি অর্থাৎ ছোট ব্যানার্জি। ছোট ব্যানার্জির সঙ্গে এক আধ মিনিট আলাপ হল, সেদিনই জাহাজ থেকে নেমেছে—তক্ষুনি কোথায় বেরিয়ে গেল কার সন্ধানে। তারপর রাত্তির দশটা পর্যন্ত সে এল না। আমরা ভাবলাম পরে আসবে—এই ভেবে শুতে গেলাম।

রাত প্রায় তিনটের সময় হঠাৎ আমার গায়ে প্রবল এক ধাক্কা। চোখ খুলে দেখি মাইকেল আর মার্টিন। কী ব্যাপার? মাইকেল কাঁপতে কাঁপতে বললো, ভূত! এ বাড়িতে ভূত আছে! আমি বললাম, না ভূত নেই। ভূত বলে কোনো জিনিস নেই। মাইকেল বললো, আমি স্পষ্ট দেখেছি। আমি বললাম, ওতে প্রমাণ হয় ভূত নয় সেটা। ভূতকে দেখা যায় না! মাইকেল রেগে বললো, ভূতের রূপ দেশে দেশে বদলায়। আমাদের দেশে ভূত দেখা যায়। আমি তখন বললাম, কৈ দেখি কোথায় তোমার ভূত? মাইকেল বললো, তেতলার সিঁড়িতে—বাথরুম থেকে আসছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম। ঠিক যেন একটা লোক বসে রয়েছে। কালো মুখ।

আমাকে সাহস দেখাতেই হ'ল। একটা লাঠি হাতে নিয়ে প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করতে করতে উঠছি, দেখি

সত্যিই একটা লোক বসে আছে। লোকটির গায়ে ওভারকোট। হাঁটুর উপর তার দুটি হাত এবং মাথাটা তার হাতের উপর বিশ্রাম করছে। হঠাৎ ওভারকোটটিকে পরিচিত মনে হল। ডাকলাম, ব্যানার্জি! মাথা তুললো সে। ঠিক ধরেছি—নয়া আমদানী ব্যানার্জি মশাই আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসবার চেষ্টা করলেন। মাইকেল এবং মার্টিন দুজনে নেমে চলে গেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

বললাম, কী ব্যাপার—সিঁড়িতে ?

—আর কোথায় থাকবো বলুন ?

—কেন ঘরে ?

—কোন্ ঘরে ? আমার ঘর গুলিয়ে ফেলেছি। রাত বারোটায় বাড়িতে এসেছি, কাউকে যে জিজ্ঞেস করবো তার জো নেই—আবার ভুলে অন্যের ঘরে না যাই, তাও তো দেখতে হবে ?

—তা বটে। এক কাজ করুন, এই ঘরে একটি খাট খালি আছে, এই ঘরে সাবধানে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—আপনি দেখিয়ে দিন।

দেখিয়ে দিলাম।

মণিদা একদিন বললেন, পোর্টোবেলো রোডের এক মাছের দোকানে ঠিক কাতলার মতো একরকম মাছ দেখে এসেছি। আজ মাছ রান্না করতে হবে।

আমরা বললাম, আপনি রান্না করতে পারেন ?

—আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি। কোলকাতার হোটেল হার মেনে যায় আমার রান্নায়।

—তবে এতদিন বলেননি কেন ? আর রান্নাই বা করেন না কেন ?

—বুঝলে ভাই, এদেশে কি আর রান্না করতে এসেছি। মাছ দেখে আর লোভ সামলানো গেল না। আমি মিসেস ম্যাথার্সকে বলে

রাখছি রান্নাঘরটি আমাদের চাই বিকেল বেলা। শনিবার তো বিকেলে রান্না হয় না।

মণিদা একজন "অ্যাসিস্ট্যাণ্ট" নিয়ে চললেন পোর্টোবেলো রোডে। যখন ফিরে এলেন তখন তাঁরা নিয়ে এলেন আলু, কপি, টোম্যাটো, চাল, চিংড়ি মাছ, মাখন আর প্রায় ছুসেরি একটা কাতলা জাতীয় মাছ। ইংরিজি নাম কার্প। প্রতি পাউণ্ডের দাম আড়াই শিলিং।

মণিদা বললেন, সব সমেত খরচ হ'ল প্রায় এক পাউণ্ড। এ সপ্তাহে প্রত্যেকের চার শিলিং ক'রে খরচ পড়বে—যদি পাঁচ জন খাই আমরা। আগামী সপ্তাহে খরচ পড়বে ছু আড়াই শিলিং এক একজনের।

—আগামী সপ্তাহেও রাঁধবেন ?

—প্রত্যেক শনিবার রান্না করবো আমি।

সপ্তাহ পাঁচেক এমনি চলার পর মণিদা ব্লেনিম ক্রেসেণ্ট ছেড়ে সেণ্ট ল্যুকস রোডে চলে গেলেন সেই পাড়াতেই। সে বাড়ির মালিকও মিসেস ম্যাথার্স। মিসেস ম্যাথার্সের ছুটি বাড়ি ছিল, আর আয় হত প্রচুর।

চলে যাবার আগে মণিদার রান্না আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়েছিল। কেবল আমাদের বাড়ি নয়, আশেপাশের ভারতীয়রা, বিশেষ করে পরিচিত বাঙালীরা আমাদের বাড়িতে প্রতি শনিবারে আসতে আরম্ভ করলো। পাঁচজনের জায়গায় দশজন, কখনও পনর জনের জন্য রান্না করতে হ'ত। মণিদার রান্না যে এত ভাল হ'তে পারে তা কখনো ভাবিনি। আমাদের বাড়ি থেকে আধমাইলের কিছু দূরে একটি রেস্তোরাঁ—তার নাম বেঙ্গল-রেস্তোরাঁ—সেখানে আমরা ছু-একবার অনেক পয়সা খরচ করে মাছের ঝোল ভাত, ডাল তরকারী খেয়েছি বটে, কিন্তু মণিদার রান্নার কাছে সেগুলো কিছুই নয়! খরচের

দিক দিয়ে দেখলেও আমাদের লাভ হ'ত প্রচুর। ভারতীয় দোকান-গুলিতে দাম সচরাচর এত বেশি হ'য়ে থাকে যে সেখানে সজ্ঞানে কখনো খেতে যাইনি। হুজুগে পড়ে ক-একবার গেছি—কিন্তু খেতে ভাল লাগলেও তৃপ্তি খুব পাইনি। লণ্ডনে একদা হিসেব করে দেখেছিলাম ভারতীয় রেস্তোরাঁ রয়েছে ষাটের বেশি—আরো যাঁরা খবর রাখেন ব'লে আমাদের ধারণা, তাঁরা বলেন একশোরও বেশি ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে লণ্ডনে—এবং প্রত্যেকটিই চালু দোকান। দোকানগুলির নাম শুনলেই প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলি ভারতীয় দোকান যেমন—বীরস্বামী, কোহিনূর, আসাম-রেস্তোরাঁ, ক্যালকাটা-রেস্তোরাঁ, আলবিয়ন-ইণ্ডিয়ান-রেস্তোরাঁ, ইণ্ডো-এসিয়াটিক-রেস্তোরা, সাহা'স রেস্তোরাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতীয় রেস্তোরাঁ আমরা যতদূর পারি পরিহার করেছি—কারণ সেখানকার খাবারের দাম এত বেশি যে আমাদের পক্ষে দু-একবারের বেশি খাওয়া সম্ভব হয় না মাসে। আরো ভয়—যদি ভারতীয় খানা খাওয়া অভ্যেস হ'য়ে যায় তখন কি করা যাবে ? আমাদের লায়ন্সই ভাল।

লায়ন্স দোকানগুলির সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার মণিদার সঙ্গে গিয়ে। তিনি বলেছিলেন এই দোকানে খেতে, কারণ এখানে খাবার পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, দ্বিতীয়ত এর মতো সস্তা দোকান ভূভারতে নেই, লণ্ডনে তো নেই-ই, তৃতীয় এদের চা খুব ভাল। আর খাবার ? স্বাদ খুব ভাল না—তবে খুব খারাপও নয়। লায়ন্স-এর দোকানে তখন সত্যি কমদামে সব খাদ্য পাওয়া যেত।

মণিদার সঙ্গে প্রথম দিন গিয়েছি নটিংহিল গেটের লায়ন্সের দোকানে লাঞ্চ খেতে। (লণ্ডনে এদের বোধ করি শ খানেকের বেশি দোকান আছে) কিউতে দাঁড়িয়েছি খাদ্য নিতে। নানারকম খাবার সাজানো রয়েছে তাকে—সঙ্গে দাম লেখা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে ট্রেতে রাখছি। মাছ এবং আলুভাজা, রুটি মার্গারিন বা মাখন, একটা অ্যাপল টার্ট এবং এক কাপ চা এ সমস্ত মিলে দাম পড়লো এক শিলিং

ন পেনির কাছাকাছি। দাম দিয়ে গিয়ে অসংখ্য টেবিলের একটিতে বসলাম। যথাস্থানে কোট খুলে রাখলাম। তার পর খেতে বসলাম। চায়ের স্বাদ সত্যিই ভালো, কিন্তু মাছ বিস্বাদ, আলু বিস্বাদ, কিন্তু খিদে পেলে মোটামুটি খাওয়া যায়। খাচ্ছি—হঠাৎ শুনি প্রচণ্ড একটি কাপ প্লেট ভাঙার আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি এক বুড়ো ভদ্রলোক



খাবার আনতে আনতে হঠাৎ পড়ে গেছেন। আহা, এত সাধের খাবার তাঁর সেটা সব নষ্ট হল। এখন হয়তো তাঁকে কাপ প্লেটের দাম দিতে হবে। কিন্তু তা দিতে হল না। একজন পরিচারিকা এসে তাঁকে একটা টেবিলে বসিয়ে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে নতুন খাবার এনে দিল। প্লেট ভাঙার জন্য তো দাম নিলই না, এমনকি খাবারের জন্যও নতুন করে দাম দিতে হল না। মণিদা বললেন, এই হল বিলেত—আমাদের দেশে হলে—। আমি বললাম, আমাদের দেশে হলে কি হত সেটা বলতে হবে না, অনুমান করতে পারি। আমাদের দেশ হলে ঐ সমস্ত ভাঙা প্লেটের এবং কাপের জন্য পুরো দাম আদায় করা হত—ভদ্রলোককে দোকানদার এসে রূঢ় কণ্ঠে বলতো, মশাই হোটেলে খেতে আসেন কেন, অতি উৎসাহী দু-একজন হয়তো আরো এক ধাপ এগিয়ে যেত। নানারকম বাক্যবাণে অস্থির করে তুলত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিলেত দেশটা যে মহাঞ্জোদরোর সময় অসভ্য ছিল, রাজা অশোক যখন বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করছিলেন তখন তাদের ধর্ম বলে কোনো বালাই ছিল না তা এই রকম ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়। এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা আরো ওদেশে ঘটেছে দেখেছি যার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই, যেমন চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হলে বাস কর্তৃপক্ষ আহত লোককে যথেষ্ট টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করে —অবশ্য যদি প্রমাণ হয় ড্রাইভার বা কণ্ডাক্টরের দোষ। এরকম

অস্বাভাবিক যে দেশ, সে দেশে হঠাৎ পড়ে যাওয়া ভদ্রলোককে খাবার কেবল এনে দিল তাই নয়, একজন ম্যানেজেরেস জাতীয় ভদ্রমহিলা এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করলেন, যেন পড়ে যাওয়ার জন্য তাঁরাই দোষী। আমাদের দেশে অমন ব্যবহার করলে লোকে দশ মিনিটে দোকান ভেঙে দিয়ে চলে আসতো। উচিত শাস্তি হ'ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রান্নার ব্যাপারে মণিদার জনপ্রিয়তা মিসেস ম্যাথার্সের নজর এড়ালো না। মিসেস ম্যাথার্স এ ব্যাপারে একটু অস্বস্তি বোধও করতে লাগলেন। শনিবারে কেউ আর বিকেলে হাই-টি খাই না। সবাই মণিদার রান্না মাছ মাংস খাবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকি। এই ব্যাপারে মিসেস ম্যাথার্স প্রচুর ভেবেছিলেন। অবশেষে একদিন স্থির করলেন মণিদার খ্যাতিকে অন্তত ম্লান করতে হবে! একদিন দেখি, ডিনারের সময় আমাদের থালায় প্রচুর ভাত আর তার সঙ্গে সুন্দর চাটনী। ভাত এবং চাটনী এক সঙ্গে খাচ্ছি ভালই লাগছে। অরুণ পালিত বললো, আগে তো মাছ মাংস তবে তো চাটনী। মিসেস ম্যাথার্সকে বলে দিতে হবে যে চাটনী প্রধান ডিশের পরে সার্ভ করতে হয়। মিসেস ম্যাথার্স হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে—অরুণ বললো খুব ভালই হয়েছে তবে····।

—তবে? মিসেস ম্যাথার্সের প্রশ্ন।

হঠাৎ প্রভাস বলে উঠলো, তবে চাটনীতে মাংস দেয় না।

আমি তখন দেখলাম চাটনীতে মাংস রয়েছে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিসেস ম্যাথার্স হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, বই দেখে মাংসের কারী রান্না করলাম আর তোমরা বলছো চাটনী! তোমরা নিশ্চয় ঠাট্টা করছো?

আমাদের শেষ পর্যন্ত বলতেই হল যে আমরা সত্যিই ঠাট্টা করছি। মাংসের মধ্যে কয়েক পাউণ্ড চিনি এবং সমপরিমাণ আপেল আমাদের

দেশে সবাই দিয়ে থাকে বৈ কি। লঙ্কা আদা এবং পেঁয়াজ মাংসে মোটেই দেয় না। একথা শুনে মিসেস ম্যাথার্স খুশিই হলেন। কিন্তু আমাদের দুঃখের দিনও তখন থেকেই শুরু হল। মিসেস ম্যাথার্স বিনা নোটিসে প্রায়ই আমাদের নানারকম 'ইণ্ডিয়ান খাদ্য' খাওয়াতে লাগলেন। ডাল, আলুর দম ইত্যাদি। সমস্তই তিনি বিলিতি পাক প্রণালী বই থেকে শিখেছেন। সমস্তই মিষ্টি।

পরে বিলিতি পাক প্রণালী আমি দেখেছি। সেগুলি কোন উন্মাদ রচনা করেন জানি না, তবে মাংসে চিনি আপেল এবং কিসমিস দেওয়ার কথা আছে—কিন্তু রসুন এবং পেঁয়াজ সম্পর্কে প্রায় নির্বিকার। মিসেস ম্যাথার্সের দোষ এ ব্যাপারে বিশেষ ছিল না—কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি বাড়ি ছেড়ে দেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলাম। আর সহ্য হচ্ছে না।

পেঁয়াজ ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয়। তবে ইংল্যাণ্ডের পেঁয়াজের ঝাঁজ খুব কম, পেঁয়াজগুলির আকৃতিও বিশাল ; ইংল্যাণ্ডে খুব কমই পেঁয়াজ চাষ হয়। সম্ভবত বটানিক্যাল গার্ডেন ছাড়া আর কোথাও হয় না। বৃটেনের পেঁয়াজের সরবরাহ আসে ফ্রান্স, স্পেন এবং অন্য দেশ থেকে। ১৮৩২ সালে প্রথম একজন ফরাসী এই ব্যবসা আরম্ভ করে। তার নাম ছিল ফ্রান্সিস। পেঁয়াজকে বলা হত ভিজে রুটি। এই ভিজে রুটি নিয়ে লণ্ডনে ফিরিওয়ালারা ফিরি করতো বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে। পেঁয়াজগুলি তারা থলিতে ভরে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে নেয়, অনেকগুলো পেঁয়াজ এক একটা লাইন করে ঝোলে, ঠিক দেখে মনে হয় সোনালি চুলের বিনুনি। যুদ্ধের আগে পেঁয়াজ সমস্ত দোকানে পাওয়া যেত না তাই ফিরিওয়ালাদের মোটামুটি ভাল লাভই হত। এরা কিন্তু সবাই ফ্রান্সের ব্রিটানি বলে জায়গা থেকে আসে। যখনি সে দেশে চাকরির অভাব দেখা যায় এরা পেঁয়াজ আর রসুন নিয়ে চলে আসে ইংল্যাণ্ডে। এখনও প্রায়ই দেখা যায় তাদের পেঁয়াজ রসুন ফিরি করতে। এক একটা বড় রসুন চারপেনি থেকে ছ পেনি দাম। ফিশ অ্যাণ্ড চিপস-এর

দোকানে পেঁয়াজ প্রচুর ভাজে তারা আর মাছ আর আলু ভাজার সঙ্গে খায়। ভিনিগারে ভেজানো পেঁয়াজ মাছভাজা দিয়ে খেতে ইংরেজদের ভাল লাগে, আমাদের কাছে মোটেই ভাল লাগে না।

লণ্ডনে সবজাতের লোক থাকে বলে এখানে সবজাতের খাবার পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিস কমই আছে। তবে বহুদিন থাকা সত্ত্বেও পটোল, ওল, ঝিঙে এবং সজনে ডাঁটা দেখতে পাইনি। ওল পাওয়া যায় শুনেছি কখনো কখনো, তবে নিজে দেখিনি। ওখানে কমলালেবু, আঙুর, আপেল, দারচিনি, হলুদের গুঁড়ো, আদা, পাঁপরভাজা, শুকনো ডালের বড়ি, পান, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, ধনে, মুগ, মশুর, মটর ডাল, চাল (পাটনাই এবং অন্যান্য), এলাচ, লবঙ্গ, সরষে, সরষের গুঁড়ো, আমের চাটনী, কুলের চাটনী, তেঁতুল এ সমস্তই পাওয়া যায়। টিনভর্তি সরষের তেলও পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতীয়রা যাঁরা ওখানে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন তাঁরা জলে পড়ে না। দিব্যি দেশী খাদ্য খেতে পারেন এবং ভারতীয় চিন্তাও করতে পারেন—বৃটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া হাউস এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে ভারতীয় বই নিয়ে পড়তে পারেন। এমনকি, ভারতীয়দের বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে, প্রাদেশিক সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা সে সমস্ত জায়গায় দেখানো হয়। মহারাষ্ট্র সমিতি, কেরল সমিতি, বাঙালীর আড্ডা ইত্যাদি। এ সমস্ত জায়গায় যেমন ভাল ভাল কিছু হয় তেমনি এ সমস্ত আস্তে আস্তে ভারতীয়দের পৃথক করেও তোলে। বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠী সবাই আত্মকেন্দ্রিক দলগুলিতে ঢোকে এবং মোটামুটি সুখে থাকে। কারণ অন্যের সংস্কৃতির সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জাগিয়ে রেখেছে। বাঙালীদের সঙ্গে মিশলে দেখা যায় বাঙালী অন্য সমস্ত প্রদেশের চাইতে যে কোনো ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ—সাহিত্যে, কাব্যে, রাজনীতিতে, সঙ্গীতে, কর্মক্ষমতায়, বুদ্ধিতে, ভাষা শিক্ষায়। আবার একদল মারাঠীর সঙ্গে মিশলে দেখা যায় মারাঠীরাও এ সমস্ত ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ। সব দলই এতে সুখে থাকে। কিন্তু বুঝলাম না একটা

ব্যাপার—এ সমস্ত সত্ত্বেও লণ্ডন মজলিশ—সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কেমন করে লণ্ডনে গড়ে উঠলো। এটি নেহাতই যে অন্যায্য ব্যাপার, কারণ সেখানে যে, স্বীকার করতেই হয় অন্য প্রদেশের লোকেরাও কেউ কম নয়। স্বীকার করতেই হয় মাদ্রাজীরা ভদ্র, মারাঠীরা কবি এবং বীর, উত্তর প্রদেশের সংগীতের অপরূপতা।

দল থাকলেই দলাদলি—এবং রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী প্রবেশ। লণ্ডন মজলিশেও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। অর্থাৎ একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। সর্বভারতীয়তার রূপ দেয় বা দেবার চেষ্টা করে লণ্ডন মজলিশ। দলাদলি হয়—তা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা সেখানেও কিছু কিছু অনিবার্য ভাবেই প্রতিফলিত হয়। সম্ভবত ১৯৫২ সাল থেকে মজলিশ মেলা শুরু হয় নতুন কর্মসচিবের তত্ত্বাবধানে। এই নতুন কর্মসচিবদের আমরা চিনতাম। অতএব তাদের ভোট দিয়ে জেতানোর জন্য আমরা পাঁচ শিলিং খরচ করে সভ্য হয়ে গেলাম। ডক্টর প্রমোদ ব্যানার্জি তখন প্রেসিডেণ্ট হলেন। প্রমোদদা সকলেরই প্রিয় ছিলেন—বাঙালী এবং অবাঙালী তাঁর যেমন কোনো বাছবিচার নেই, তেমনি তাঁর ভক্তদের মধ্যেও দেখা যেত সমস্ত জাতের লোককে। এই ভোটের ব্যাপারে বিশেষ ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আমরা প্রচুর মেম্বর করেছিলাম, যাতে আমাদের চেনা দল জিতে যায়—আর বিপক্ষ দল ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ক্রমওয়েল রোডের ভারতীয় ছাত্রাবাসে ভোট নেওয়া হয় এবং সে ব্যাপারে উত্তেজনা হাতাহাতি এবং কিছু মারামারিও হয়। কারণ যে দলকে আমরা হারিয়ে দিচ্ছিলাম ভোটে, তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের হারানোর জন্য তাদের চাইতে বেশি লোক আমরা জমায়েত করেছিলাম। তারা সেদিনকার মতো ভোটিং মুলতুবি রাখার চেষ্টা করছিল। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে তারা সবাই চিঠি পায়নি। ডক্টর প্রমোদ ব্যানার্জি বললেন, চিঠি অর্ধেক লোক পেয়েছে, বাকী অর্ধেক লোক পায়নি এটা

অবিশ্বাস্য। পরে তিনি প্রমাণ করলেন যে, চিঠি সমস্ত সভ্যকেই পোস্ট করা হয়েছিল—সভ্যরা অনেকেই ঠিকানা বদলানোর জন্য সবাই না পেয়ে থাকতে পারেন—কিন্তু সেজন্য নির্বাচন বন্ধ রাখা যায় না। অতঃপর তাদের আর কিছু বলবার রইল না—অতএব ভারতীয় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে তারা যা করলো তা এই ঃ বিদ্যুৎ বেগে ভোটিং-এর সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে তাদের দলের একটি ছেলে কোথায় উধাও হয়ে গেল। অর্থাৎ ভোট গুনবার আগেই ব্যালট পেপারগুলির পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘটনাটা এমনি তাড়াতাড়ি ঘটেছিল যে চট করে তাদের এই নব কৌশল ধরা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সামলে নিতে খুব বিলম্ব হল না। হঠাৎ দেখা গেল নিশীথ মুখার্জি এবং জ্যোতির্ময় রায়কে বিপক্ষ দলের সমর্থককে বামাল সমেত ধরে আনতে। ব্যালট পেপার গোনা হল—আমাদের সমর্থিত দল অনেক বেশি ভোট পেয়ে জিতে গেল। এই মজলিশে আমাদের পরিচিত বহু ছেলেমেয়ে কাজ করতো। আমাদের বাড়ির জীবন লোকুড় প্রথম দিকে এর একজন পাণ্ডা ছিল।

লণ্ডনে আমাদের কারুর কখনো পকেট মারা যায়নি। লণ্ডনে পকেটমার ব'লে কোনো ব্যবসা চলে না। এটা ভারতীয়দের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। পকেট মারাটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম। যে শহরে পকেটমার নেই, সে শহর যে কী ভীষণ অস্বাভাবিক শহর তার হিসেব নেই। অনেক ভারতীয়ের লণ্ডন বেশিদিন ভাল লাগে না। তার কারণ ঠাণ্ডা নয়, বরফ নয়, গোলমালের অভাব। কোনো গোলমাল নেই, দাঙ্গা নেই, হাঙ্গামা নেই, এমনকি পকেটমার পর্যন্ত নেই—থাকলেও সেগুলোর সংখ্যা এত কম যে চোখে পড়ে না—আর যদি বা চোখে পড়ে তো দেখা যায় তারা অধিকাংশই বিদেশী। এ কেমন শহর ? আমাদের অভ্যেস প্রতিবেশীকে যথাসাধ্য বিরক্ত করা, অত্যাচার করা, লাউড স্পীকার

নিয়ে কোনো কোনো সময় সমস্ত রাত পড়শীদের জাগিয়ে রাখা, কেউ প্রতিবাদ করলে দাঁত ভেঙে দেওয়া ; এ সমস্ত না করতে পারলে আর শহরে থাকা কেন। গ্রামে গিয়ে থাকলেই তো হয়। এই সমস্তের অভাবে ভারতীয়রা, বিশেষ ক'রে কোলকাতাবাসীদের লণ্ডনে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হয়। আস্তে আস্তে কথা বলা বিলিতি লোকেদের অভ্যেস—কেন তাই বলে ভারতীয় হ'য়ে আস্তে কথা বলবো ? অতএব জোরে জোরে দেশী ভাষায় বাসে বসে আমরা গল্প করে কিছুটা অন্ততঃ নিজেদের দেশকে ফিরে পাই। আমাদের আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—লণ্ডনে নিজেদের মধ্যে প্রায় সর্বদাই আমরা ইংরিজিতে কথা বলি—কিন্তু একজন অপরিচিত অন্য প্রদেশীয় দেশীয় লোক থাকলেই বাঙলায় কথা বলতে শুরু করি। এই অভ্যেসটা এমনি বাঙালী যে লণ্ডনে সেটা ক'রে আমরা যথেষ্ট আরাম বোধ ক'রে থাকি। বাঙলা ভাষা তো খারাপ ভাষা নয়—তবে কেন লোকদের আপত্তি ?

যত দিন যেতে লাগল ভারতীয়দের সংখ্যা দেখে তাজ্জব বনে যেতে লাগলাম। এত ভারতীয় সেখানে থাকে যে, তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। এখানে মনে রাখতে হবে, সমস্ত লণ্ডনবাসীর সংখ্যা প্রায় আশী লক্ষ, এর মধে ভারতীয়ের সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজার—শতকরা একও হয়তো নয়। কিন্তু আমরা ভারতীয় বলে, ভারতীয়দের সঙ্গে ক্রমশ পরিচয় হতে থাকে এবং পরিচয় বাড়তেও থাকে। কেবল তাই নয়, প্রচুর পরিচিত লোক যে আসতে চায় লণ্ডনে কোলকাতা থেকে, তারও রাশি রাশি প্রমাণ আমিও পেতে লাগলাম। অগুনতি চিঠি আসতে লাগল—চেনা বন্ধু পরিচিতদের কাছ থেকে, ভাই আমি লণ্ডনে যাচ্ছি, স্টেশনে থাকিস। আমার জন্য একখানা ঘর ঠিক করে রাখিস, শস্তা যেন হয়—আর একটা চাকরিও ঠিক করে রাখিস। অনেকেরই ধারণা তখন ছিল যে বৃটেনে যখন চাকরি পাওয়া যায়, তখন যে কেউ যখন খুশি চাকরি পেতে পারে। এ রকম কত চিঠি যে আমি এবং আমার বন্ধুবান্ধবেরা পেয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। ধারণায় যে খুব লভু ছিল

তা নয়—বৃটেনে চাকরি পাবার আশা কম—ছাত্র হলে বছরে কয়েক সপ্তাহের জন্যে চাকরি পাওয়া সুবিধে, বড়দিনের সময় পোস্ট.অফিসে, গ্রীষ্মের সময় আলু তোলা বা ফল তোলার কাজ কিন্তু প্লেট পরিষ্কার করা বা কয়লা খনিতে কাজ করা ছাড়া সহজে কোনো কাজই পাওয়া সম্ভব নয়। কারখানায় অ্যাপ্রেনটিস-এর কাজ পাওয়াও যথেষ্ট কঠিন। তারা সমস্ত কারখানায় বিদেশী নিতে চায় না।

ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে যত দিন ছিলাম লণ্ডনের দ্রষ্টব্য জিনিস কিছু দেখিনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম সমস্তই দ্রষ্টব্য, অতএব বিখ্যাত জিনিসগুলি পরে কোনো সময়ে দেখলেই হবে। প্রেরণা পেলাম করুণ মিত্রের কাছ থেকে। সে ওখানে তিন বছর আছে অথচ বাকিংহাম প্যালেস তখনো দেখেনি শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম বলাই বাহুল্য। কথাটা যাকে পাই তাকেই বলি। একদিন জীবন লোকুড়কে বললাম, আমার এক বন্ধু বাকিংহাম প্যালেস এখনো দেখেনি। জীবন বললো সেও দেখেনি। কেবল তাই নয় সে এখনো বৃটিশ মিউজিয়াম, টাওয়ার, উইণ্ডসর কাসল, হ্যাম্পটন কোর্ট ইত্যাদি দেখেনি। শুনে আমার বেশ আনন্দই হল। আমি খুব খুশি হলাম। ভাবলাম দেখি মিস্টার ম্যাথার্স কি কি দেখেছেন। মিস্টার ম্যাথার্স একজন খাঁটি ইংরেজ এবং লণ্ডনবাসী। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বৃটিশ মিউজিয়াম দেখেছেন কি না? মিস্টার ম্যাথার্স বলতে আরম্ভ করলেন ব্যাপার হচ্ছে কি—জায়গাটা কোথায় তা আমি জানি, হোবর্ন স্টেশন বা টটেনহ্যাম কোর্ট রোড স্টেশনে নামলে কাছেই কোথাও হবে, পিকাডিলি থেকে নেমেও যাওয়া যায়—বিরাট বাড়ি—সুন্দর সব জিনিসপত্র আছে ভেতরে—দেখবার জিনিস।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনো গেছেন কি? প্রশ্নটা করলাম একেবারে সোজাসুজি। মিস্টার ম্যাথার্স বললেন, দেখি ভেবে। অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, একবার তিনি গিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের আগে—ঐ যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর আগে।

এর পর যত লোককে দেখেছি দু চার পাঁচ বা আরো বেশি বছর লণ্ডনে আছেন, তাঁরা কেউই বৃটিশ মিউজিয়াম দেখেননি। অথচ যাঁরা লণ্ডনে দু-চারদিন থাকেন তাঁদের সমস্ত দ্রষ্টব্য ব্যাপার দেখা শেষ হয়ে যায়। এই থেকে আমরা একটা থিয়োরী সৃষ্টি করেছি যে কোনো শহরকে জানতে হলে হয় সাত দিনে সমস্ত দেখে ফেলা প্রয়োজন, নইলে অন্তত কুড়ি বছর থাকা প্রয়োজন—এর মাঝামাঝি সময়ে কোনো বড় শহর দেখা সম্ভব হয় না। আমরা সবাই সাত দিনের বেশি এবং কুড়ি বছরের কম লণ্ডনে ছিলাম—তাই আমাদের দেখা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। স্কটল্যাণ্ড, মাঞ্চেস্টার থেকে আমাদের বন্ধু-বান্ধবেরা অনেক সময় একদিনেই সমস্ত লণ্ডন দেখে ফেলেছেন।

আমাদের পাড়াটির বিচিত্রতা যথেষ্ট ছিল—পাড়ায় যদিও পার্ক খুব বেশি ছিল না—ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলাধুলো করতো। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি জায়গায় টেনিস খেলবার বন্দোবস্ত ছিল। জীবন, প্রভাস, অরুণ, কানুনগো এরা সুযোগ পেলেই সেখানে গিয়ে সামান্য পয়সা খরচ করে খেলতে যেতো। আমিও ওদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছি কিন্তু টেনিস খেলা আর সম্ভব হয়নি। প্রায়ই র‍্যাকেটের সঙ্গে বল লাগেনি, মিছিমিছি দৌড়েছি, যখন লেগেছে তার ফল হয়েছে চমকপ্রদ। প্রায়ই আমার বল প্রতিপক্ষের দিকে তেড়ে না গিয়ে রকেটের মতো উপরের দিকে উঠেছে। অরুণ পালিত আমাকে



প্রায়ই ধমকেছে, তুই খেলতে আসিস কেন? আমি সেই ধমক শুনে জেদ করে আরো খেলেছি কিন্তু কিছুমাত্র উন্নতি করতে পেরেছিলাম বলে দাবি করি না। গলফের ছোট সংস্করণ পার্টিং দি গ্রীন খেলাটা মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলাম, কিন্তু এ খেলায় উত্তেজনার নিতান্ত অভাব বশত খেলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম! অরুণ খুব ক্রিকেট ভক্ত,

আমি খেলাটা দেখতে পছন্দ করি কিন্তু কে খেলছে কে খেলছে না তা আমার জানবার প্রয়োজন হয় না। বল ব্যাটের কাছাকাছি এলে মারা প্রয়োজন—তা যখন দেখি কোনো ব্যাটসম্যান মারছে না তখনি সে খেলা দেখতে বিরক্ত বোধ করি। তাই ১৯৫২ সালে যখন ভারতীয় দল লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে খেলতে এলো তখন সবাই খেলা দেখতে গেল, কেউ স্কুল কলেজ কামাই করলো, কেউ অফিস থেকে পালালো বাজে অজুহাতে, কেউ ছুটি নিল—আবার একদল ম্যাঞ্চেস্টার, লীডস, প্যারিস বা গ্লাসগো, এডিনবরা থেকে ছুটে এলো লণ্ডনে ক্রিকেট খেলা দেখতে! অরুণ পালিত আমাকে অনেক কষ্টে রাজী করালো লর্ডসে ক্রিকেট দেখতে। স্কটল্যাণ্ডের কেল্টি গ্রাম থেকে এলো পুলক বসু।

ক্রিকেট খেলা ধীর গতিতেই আরম্ভ হল। যাঁরা খবর রাখেন খেলার—তাঁরা নিশ্চয় বলতে পারেন কী ঘটেছিল। আমার দু-একটি জিনিস কেবলমাত্র মনে আছে—আমরা তিন শিলিং-এর টিকিট কিনেছিলাম, সকাল আটটা থেকে কিউতে দাঁড়িয়েছিলাম, খেলা দেখতে গিয়ে আজেবাজে অনেক গল্প করেছিলাম। ভিনু মানকড় যখন খুব পিটিয়ে খেলছিল তখন কোনো কোনো ইংরেজ ব্যারাক করছিল—ব্যারাকিং-এর এমন ভাষা শুনিনি কখনো। কেবল একটি কথা—স্ট্যা-লিন! যখনি মানকড় বল মারতে যাচ্ছে তখনি এক পাশ থেকে শোনা যাচ্ছে স্ট্যা-লিন!! তারপর আস্তে আস্তে মাঠ কেবলি বলতে লাগলো, স্ট্যা-লিন! স্ট্যা-লিন!!

স্ট্যালিন যা করতে পারেনি তা সম্ভব করলো ইংল্যাণ্ডের রানী দ্বিতীয় এলিসাবেথ। (প্রথম এলিসাবেথ স্কটল্যাণ্ডের রানী ছিলেন না বলে স্কটল্যাণ্ডের একদল এখন বলছেন তাঁরা এই রানীকে দ্বিতীয় বলতে চান না, কারণ তাদের পক্ষে ইনিই প্রথম।) রানী হঠাৎ খেলা দেখতে এলেন সদলে। এসে সমস্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। খুব ভদ্রভাবেই করলেন কিন্তু ফল যা হল মারাত্মক।

তার পনর মিনিট পরেই ভারতবর্ষের দলটি ভেঙে পড়লো। একের পর এক ব্যাটসম্যানেরা পতিত হতে লাগলেন। রানী দ্বিতীয় এলিসাবেথের নাম করা ভারতীয়েরা সকালে উঠে ছেড়ে দিল।

এই সময় এক সাধুর পাল্লায় পড়েছিলাম। আমাদের বাড়ির কাছেই সেণ্ট স্টীফেনস গার্ডনস-এ থাকতো। প্রথম যেদিন ওকে দেখি ওর দুই বগলে দুটি বিশাল পাউরুটি। আমার সঙ্গে দেখা হবার সময় বললো, আপনি! দশ মিনিট পরে সে আমাকে তুমিতে দাঁড় করিয়েছে। মিনিট কুড়ি পর বললো, আয় না আমাদের বাড়িতে খাবি। আজ মাংস রাঁধছি। সাধু ঘটকের এই খাওয়ানো ব্যাপারটা ছিল একটা নেশা। সে কাউকে না খাইয়ে থাকতে পারত না। সপ্তাহে অন্তত একদিন তার বাড়িতে বিরাট ভোজের আয়োজন হত। বিরাট অর্থাৎ প্রচুর মাংস, ঝোল আর রুটি মাখন।

সাধু ঘটকের বাড়িতে সেদিন যাইনি। পরে আর একদিন বললো, কী রে, এলি না কেন সেদিন আমার বাড়ি? খারাপ? তা যা না, লায়ন্সে গিয়ে খা পচা জিনিস। ভাল জিনিস তোর ভাল লাগবে কেন? এর পর যেখানেই সাধুর সঙ্গে দেখা লণ্ডন মজলিশে বা অন্য কোন বন্ধুর বাড়িতে, সাধু আমাকে ক্রমাগত বলতে লাগলো ওর বাড়িতে না যাওয়ার নিশ্চয় কোন বিশেষ অর্থ আছে। আমি যত বলি মিসেস ম্যাথার্স রান্না করে রাখেন সেটা নষ্ট হবে, সাধু বলে, ভালো লাগে ঐ রান্না তাই বল না! অবশেষে ওর বাড়িতে একদিন যেতেই হল। সাধু, অর্থাৎ সাধন ঘটককে সেদিন বড় ভাল লেগেছিল। অমন চরিত্র, অপরকে আপন করে নেওয়া হৃদয় খুব কম দেখেছি। আর তার রাগ। সামান্য কারণে সে অসামান্য উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরেই তার উল্টো ক্রিয়া শুরু হ'য়ে যায়। সে অসামান্য শান্ত হ'য়ে পড়ে কম সময়ের মধ্যেই। যদি কাউকে চটিয়ে থাকে সে কোনো সময়, তার দশ মিনিটের মধ্যেই সে তার সঙ্গে মিটমাটও করে ফেলেছে। তার প্রচুর

গুণের মধ্যে একটিমাত্র দোষ—বন্ধু তার চাই-ই। একা সে কিছু করতে পারে না। নিজের জন্য সে রান্না পর্যন্ত করতে কষ্ট পায়।

আমাদের ঘরে একদিন দেখি, মার্টিন আর মাইকেল খাট তুলে



তার তলায় কিছু খুঁজছে। তার তলা থেকে গোটা দশেক কলার স্টাড পাওয়া গেল কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট হ'ল না। তারা আরো খুঁজতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলাম, কি খুঁজছ? মাইকেল বললো, আমার ইংক পেন্সিলটি। কবে হারিয়েছ? জিজ্ঞেস করাতে মাইকেল বললো, কবে ঠিক জানি না। আমি বললাম, একটা জিনিস হারিয়েছে অথচ কবে হারিয়েছে বলতে পারছ না? মার্টিন তখন বললো, দেখ অত্যধিক পকেট থাকাতেই এই বিপত্তি। আমাদের পোশাকে বড় বেশি পকেট। আমি বললাম, অর্থাৎ? মার্টিন বললো, আমাদের ক'টি পকেট দেখো—সাধারণতঃ ট্রাউজারে অন্তত তিনটে পকেট থাকে, শার্টে একটা, ওয়েস্ট কোটে চারটে, জ্যাকেটে পাঁচটা, ওভারকোটে তিনটে—ক'টা হ'ল? তার পরে বললো—ষোলটা। একজনের ষোলটা পকেট—যার চার-পাঁচটা স্যুট আর শার্ট থাকে তার প্রায় আশীটা পকেট, এখন কেউ যদি একটা পেন্সিল পকেটে রাখে এবং ভুলে যায় কোন্ পকেটে রেখেছে, তাহ'লে তাকে আশীটা পকেটে হাতড়াতে হয়। তা হাতড়াতে গেলে একটা পরিকল্পনা করতে হয়—একটি পুরো ঘণ্টা নষ্ট হয়। মেয়েদের ওসব বালাই কম। তাদের হ্যাণ্ডব্যাগে সমস্তই থাকে।

মাইকেল বললো, মেয়েদের আবার কয়েক ডজন হ্যাণ্ডব্যাগ থাকে যে তাতেই পুষিয়ে নেয়। মার্টিনকে স্বীকার করতেই হ'ল যুক্তিটি। মেয়েদেরও খুব সুবিধে নেই পেন্সিল হারালে। তবে, মার্টিন বললো, মেয়েদের কাছে কোনো জিনিস কখনো হারায় না। ওদের স্মৃতিশক্তি

পুরুষদের চাইতে কয়েকগুণ বেশি। মাইকেল উদাসভাবে বললো, তবে পৃথিবীতে গ্রেট ম্যান এত বেশি ও মেয়েদের মধ্যে গ্রেট এত কম কেন?

দুজনের তর্ক চলতে লাগলো। পেন্সিল পাওয়া গেল না।

আমি যে বাড়িতে উঠে গেলাম, সেটা বলতে গেলে পাশের পাড়াতেই। ছিলাম উত্তর কেনসিংটনে, চলে গেলাম পশ্চিম কেনসিংটনে। একটুর জন্য দক্ষিণে যাওয়া হ'ল না। দক্ষিণ কেনসিংটনের মতো সম্মান এবং নামডাক নেই, কিন্তু পাড়াটা বেশ ভালই লাগলো। রাস্তার নাম এভনমোর রোড, কেনসিংটন হাই স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে একটু নিরালায়। কোলাহল কম, যদিও কিছুদূর দিয়ে চলে গেছে রেলের লাইন—তার আওয়াজ পাওয়া যায় কান খাড়া ক'রে রাখলে। ইংল্যাণ্ডে সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এই সমস্ত পাড়া এবং পরিবেশ থেকে। পাড়ার সঙ্গে ভাষারও একটা যোগাযোগ রয়েছে। বার্নার্ড শ' তাঁর পিগম্যালিয়ন-এ দেখিয়েছেন যে কেবল পাড়া নয়, প্রতিটি রাস্তার লোকের উচ্চারণ থেকে তার জন্মস্থান বলে দেওয়া সম্ভব। ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে এই পাড়ার কৌলীন্য বেড়ে গেছে অনেকখানি বেশি। তার পর প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ ব্যাপারে উন্নাসিকতা কমে গেছে, মোটামুটি সামাজিক সাম্যের দিকে দেশ এগিয়েছে। আজকাল আয়ের অসাম্য প্রায় দূর হ'য়েছে। বড় বড় ব্যবসাদারেরা অবশ্য একটি শ্রমিকের চাইতে অনেক বেশি টাকা রোজগার করে থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক যাঁদের বলা হ'ত মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক, তাঁদের আয় এখন সমান। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আয় এখন মধ্যবিত্তদের চাইতে বেশি। অর্থাৎ শ্রমিকেরাই এখন মধ্যবিত্ত হ'য়ে পড়ছেন—স্কুল-টিচার, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদিরাই অনেক কম আয় করছেন শ্রমিকদের চাইতে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যে সমস্ত লোক রাজমিস্ত্রী ব'লে পরিচিত তাদের শিক্ষার বালাই যেটুকু আছে, তাতে

তারা নাম সই করতে পারে এবং শস্তা, সহজ ভাষায় লেখা খবরের কাগজ পড়তে পারে এমন লোকের আয় দৈনিক তিন পাউণ্ডেরও বেশি। আর একজন কেরানীর আয় দৈনিক এক পাউণ্ডের কাছাকাছি। একজন কেরানীকে কেবল ভাল শিক্ষাই পেতে হ'য়েছে খরচ করে তা নয়, তার তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি হওয়ার ফলে তার পোশাক এবং পারিবারিক খরচ অনেক বেশি হবার কথা। এক কথায় বলতে গেলে বৃটেনে শ্রমিকেরা অনেক বেশি আয় করে, অনেক কম চিন্তা করে এবং মাইনে বাড়ানোর জন্যে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেয়, কমিউনিস্টদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে তারা কমিউনিস্টদের মোটেই ভোট দেয় না। নিজেদের মাইনে বাড়ানোর জন্য তারা সর্বদা ধর্মঘট করতে প্রস্তুত এবং ধর্মঘট করেও। তারা তখন বলে, ক্যাপিটালিস্টরা খারাপ, কিন্তু বৃটিশ সৈন্য যখন আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য ব্যাপক ভাবে নরহত্যা করে তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রায় করে না বা সে ব্যাপারে ধর্মঘটও করে না। এই স্বার্থপরতা শ্রমিকদের পক্ষে অন্যায় এবং স্বাভাবিক। যখন তারা ধর্মঘট করে তখন তারা কেবল নিজের স্বার্থই দেখে। অবশ্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি গণতান্ত্রিক মত অনুসারেই চলে। কিন্তু মাইনে বাড়ানোর জন্য ধর্মঘট করবো না এমন কথা কেউ বলে না! বৃটিশ সৈন্যের অত্যাচারের দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ একমাত্র দু-একটি কাগজ ছাড়া আর কোথাও ছাপে না। . আর সে সব কাগজের বিক্রির সংখ্যা এতই কম যে তাদের প্রতিদিনই ভিক্ষে করতে হয়। কয়েকশো বছরের বৃটিশ ইতিহাস হ'ল বিদেশে ডাকাতি, লুঠতরাজ এবং নরহত্যার ইতিহাস। স্বদেশে মোটামুটি তারা গণতান্ত্রিক কিন্তু বড় বড় লোকেদের, বিশেষ ক'রে রাজপরিবার সম্পর্কে তাদের কী আগ্রহ! এই মধ্যযুগীয় অবস্থা কেমন করে চলে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি। অনেকেই এই ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, কিন্তু কিছুমাত্র সুরাহা হয়নি। আমাদের দেশে দেশী রাজারা বিলুপ্ত হলেন এক দিনে,

কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মোটেই দুঃখ হয়নি। ইংরেজরা কিন্তু নিজেদের রাজাহীন কল্পনাও করতে পারে না।

অবশ্য ইংরেজ রাজার ক্ষমতা নেই। রাজারও নেই, রানীরও নেই। ক্ষমতা নেই কিন্তু খরচ রয়েছে। রানী দ্বিতীয় এলিসাবেথ, স্বামী ডিউক অব এডিনবরা, পুত্র চার্লস, কন্যা অ্যান—এদের প্রচুর ভাতা দেওয়া হয়। তার জন্য কোনো রকম আয়কর দিতে হয় না। কেবল তাই নয়, রাজবংশের প্রচুর লোকের নানা রকম ভাতা দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিরাট অফিস রাখতে হয় তার জন্যও তো খরচ অনেক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বৃটেনে অনেক আছে বটে, কিন্তু কতকগুলো খারাপ দিকও আছে। আইনত প্রেসের স্বাধীনতা বা বাকস্বাধীনতা আছে—কিন্তু প্রেসের মালিক আছে—যে প্রেসের মালিকের মতের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থ এবং মালিকের স্বার্থ বলতে একই কথা বোঝা যায়। খবরের কাগজে বড়লোকদের পাপ কাহিনী বেরোয় কম। আদালতে বিচার হ'লেও তা সব সময়ে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় না। কেবল বড়লোক, লর্ড, ডিউক ইত্যাদিরাই ও রকম সুযোগ সুবিধে পেয়ে থাকেন। সাধারণ লোকের জন্য একরকম বিচার, অ-সাধারণ লোকদের (অর্থাৎ টাকা এবং বংশ-গরিমা যাদের আছে) জন্য আর একরকম বিচার। সমস্ত মানুষই ভগবান একভাবে সৃষ্টি করেছেন ব'লে শোনা যায়, কিন্তু পোশাক অনুসারেই তাদের মর্যাদা দেওয়া হয়। খবরের কাগজের প্রপাগাণ্ডার ফলে রাজপরিবারকে অনেকেই একটা অলৌকিক ব্যাপার মনে করে। আর সাধারণ অশিক্ষিত লোক খবরের কাগজে যখন চিঠি লেখে (Woman পত্রিকায় প্রকাশিত), প্রায়ই ভাবি বাকিংহাম প্যালেসের কর্মচারি হওয়া বেশ মজার। আপনি গর্বিতভাবে ভাবতে পারেন যে আপনি সেখানে না থাকলে প্রিন্সেস মার্গারেট ব্রেকফাস্টের সময় সেদ্ধ ডিমটি খেতে পারতেন না। তখন খবরের কাগজেও সে চিঠি ছাপে—যাতে এরকম আরো চিঠি তাদের কাছে আরো আসে।

কাগজে নাম ছাপানোর জন্য ইংরেজ কেন, বোধ হয় পৃথিবীর সর্বত্র লোকদের দুর্বলতা।

কেবল ব্লেনিম ক্রেসেণ্টের পাড়া নয়, ওয়েস্ট কেনসিংটন নয়—এমন কি ভারতবিখ্যাত ইস্ট এণ্ড পর্যন্ত সাধারণ লোক আজ অসাধারণ রকম আয় করছে। অর্থাৎ যারাই হাতুড়ি ধরতে পারে, দেয়ালে বা কাঠে পেরেক ঠুকতে পারে, ডিশ পরিষ্কার করতে পারে, বোঝা বইতে পারে। এদের সামাজিক পরিবেশ যুদ্ধের আগে ছিল দুর্দশাময়—যুদ্ধের পরে তারাই এখন সবচেয়ে বেশি খরচ করতে পারে। তারাই ছুটিতে যায় দক্ষিণ ফ্রান্সে, ইটালিতে, ব্ল্যাকপুলে বা নরোয়েতে। কেরানী এবং অধ্যাপকেরা বেশির ভাগ যায় দেশের মধ্যে ব্রাইটন অথবা ক্ল্যাকটন অন দি সী-তে! তবু ইস্ট এণ্ডের লোকেরা কিম্ভূত পোশাক পরে, খারাপ বাড়িতে থাকে, আর বিদেশীরা ভাবে তারা বুঝি সবাই গরিব। আজকাল হাল পালটেছে—এখন বলা চলে তারাই সবচেয়ে অবস্থাপন্ন। কিন্তু বহুদিনকার অভ্যাসের জন্য তারা স্বভাব ছাড়তে পারে না। ইস্ট এণ্ডে আজকাল লোকে যে অর্থাভাবের জন্য থাকে তা নয়, তাদের কর্মক্ষেত্র সে পাড়াতে বলেই থাকে। বহু লোক কর্ম উপলক্ষে সে পাড়াতে গিয়ে বসবাস করেন—কেরানী, ছাত্র, অধ্যাপক, এমনকি বিরাট যাদের আয় তারা—হোটেলের বেয়ারারা পর্যন্ত। একটি হোটেলের বেয়ারা মধ্য লণ্ডনে সপ্তাহে ত্রিশ চল্লিশ পাউণ্ড আয় করতে পারে—এতই তারা বকশিশ পায়। ইস্ট এণ্ডে একটা ঈহুদী দোকান আছে, খাওয়া যায় সেখানে—তার দাম এমনি বেশি যে আমাদের মেজো ব্যানার্জির মতে, সেখানে কেবল চাকর বাকরেরাই খেতে পারে। কোনো ভালো পোশাক দোকানে দেখে এসে মেজো ব্যানার্জি বলতো, পঁচিশ পাউণ্ড দাম! আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়—কেবল চাকর-বাকরেরাই ওগুলো কেনবার ক্ষমতা রাখে।

ওয়েস্ট কেনসিংটনের এভনমোরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার কোনোরকম সম্পর্ক ছিল না। মিস্টার পবিত্র বসুর নামে ছিল ফ্ল্যাট।

সবসমেত চারজনের থাকবার উপযোগী চারখানা ঘর দোতলা এবং তিনতলা মিলে। লোকও চারজন তবে একখানাকে ডাইনিং রুমে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। মিস্টার বোস ছাড়া দুজন যারা থাকতো তারা আমার বয়সী। একজন বাঙালী, নাম বল্টু ; আর অন্যজন সিংহলী—নাম কার্লো। এরা দুজনেই ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করতো।

কার্লো বলতো, সুখ কাকে বলে বুঝতে পারছি ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করে ; সকাল সাড়ে নটায় অফিসে যাবার কথা, যাই দশটার পর, তারপর কোট খুলে কাজে হাত দিতেই চা-এর সময়। সাড়ে দশটা থেকে সওয়া এগারোটা চা-এর সময় আইনসঙ্গত ভাবে নয়, তবে কেউ কিছু বলে না। সওয়া এগারোটায় অফিসে এসে একটা সিগারেট খেতেই পৌনে বারোটা বেজে যায়। তারপর একখানা ফাইল ওলটাতে না ওলটাতে লাঞ্চে যাবার তোড়জোড় শুরু হয়, হাত মুখ ধোওয়া, তারপর ক্যানটিনের দিকে দ্রুত পদবিন্যাস।

লাঞ্চ শেষ হবার কথা দেড়টায়, কিন্তু হয় না—কারণ 'বসে'দের (boss) লাঞ্চের সময় একটা থেকে দুটো—অতএব দুটোয় আসলে ক্ষতি নেই। এসে একখানা কাগজ হাতে নিয়ে ফাইল খুঁজতে বেরিয়ে যাই। গিয়ে দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ ভাল তা বোঝাই, ফিরে এসে একে ওকে টেলিফোন করি, চায়ের সময় হয়, তিনটে বাজে। তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে চা-এর টেবিলে রাজনীতি চর্চা করি, সেখান থেকে বেরিয়ে একটু পোস্ট অফিসে যাই। ফিরে আসি যখন চারটে বেজে গেছে ; এই সময় একখানা চিঠি লিখি কোথাও। তারপর পৌনে পাঁচটায় হাত ধোবার সময় পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় বাসের কিউতে দাঁড়াই।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবাই এমন করে কি ?

কার্লো বলেছিল, সবাই তো চালাক নয়। কেউ কেউ ঠিক সময়ে আসে, সারাদিন হাঁদারামের মতো কাজ করে। আরে বাপু মাইনে যখন একই আর কাজে উন্নতির যখন আশা নেই, তখন কাজ বেশি করে

লাভ কি? কার্লো আরো বলেছিল, কেবল তাই নয়—অসুস্থতার অজুহাতে বছরে তেরো সপ্তাহ ছুটি নেওয়া চলে—এর জন্য পুরো মাইনে দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ড স্বাস্থ্যকর দেশ—কিন্তু ইণ্ডিয়া হাউসে সবচেয়ে বেশি লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে! অনেক সময় মনে হয় অসুস্থ না হলে ইণ্ডিয়া হাউসে কাউকে নেওয়া হয় না। তা ছাড়া কত রকমের যে ছুটি আছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখানে বহু লোকেই আড্ডা মারে, বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে। এমন যে সুন্দর পরিবেশ, সেই পরিবেশ সহজে কেউ ছাড়তে চায় না। তবে শুনেছি দু-তিনজন লোক নাকি কাজ করে থাকেন। এঁরা অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের লোক—এঁরা প্রতি সপ্তাহে কয়েক লক্ষ টাকা মাইনে বিলি করেন খামে ভ'রে। যাঁরা কাজ করেন তাঁরা পান মাইনে, যাঁরা কাজ করেন না তাঁরা কি পান আলস্য ভাতা? আমার জানা নেই তাই মাইনে কথাটিই ব্যবহার করেছি। অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের এই কয়েকজন না থাকলে সমস্ত ইণ্ডিয়া হাউস অচল হয়ে পড়তো। কার্লো আরো বলতো, Happiness is no longer enough—we want more money! অর্থাৎ কেবল সুখ আর সহ্য হচ্ছে না—আরও টাকার প্রয়োজন। মাইনে বাড়াবার জন্য আন্দোলন করতো সে।

ইণ্ডিয়া হাউসে প্রায় বার শ' লোক মাইনে পায়। ভারতবর্ষের বিদেশী রাষ্ট্রদূত-ভবনগুলির মধ্যে এর চাইতে বেশি লোক আর কোথাও মাইনে পায় না। ভারতবাসী হিসাবে আমরা সব সময়েই গর্বিত বোধ করতাম—তার কারণ এই বারো শ' লোক—এত বড় রাষ্ট্রদূত-ভবন আমাদের আর কোথাও নেই।

সমাজতান্ত্রিক কার্লো লেবার পার্টির সভায় বক্তৃতা দিয়েছিল কবে একবার—অতএব সে সর্বদা উত্তেজিত হয়ে থাকতো। তার পকেটে লাল লিটারেচার ঠাসা থাকতো। সে বলতো ট্রটস্কির হত্যাকারীকে

খুঁজে পেলে সে তাকে ইরেজার দিয়ে ঘ'সে তুলে দেবে এ পৃথিবী থেকে। কার্লোর সমস্ত ব্যাপারেই উত্তেজিত হবার অধিকার ছিল। একদিন ওর সঙ্গে রাস্তায় দেখা—দূর থেকে দেখেই বললো, হ্যাম্পস্টেড স্টেশনের পাশের তামাকের দোকান থেকে কখনো সিগারেট কিনো না!

আমি বললাম, কেন? খুচরো নিয়ে গোলমাল করেছে কি?

—না তা নয়।

—তবে কি পুরোনো বাসি সিগারেট দেয়?

কার্লো বললে, না না খুব খারাপ ব্যাপার—সোশ্যালিজম-এর অ-আ পর্যন্ত জানে না! আমাকে বলে কিনা ট্রটস্কি—একজন মিউজিশিয়ান! হা—হা!

হ্যাম্পস্টেড স্টেশন এভনমোর রোড থেকে প্রায় পাঁচ মাইল।

আর একদিন বললো, আজ আর সহ্য হ'ল না। অফিসে গালাগাল করে এসেছি। আমাকে কাজ করতে বলেছিল—ইয়ার্কি নাকি? একি মামদোবাজি পেয়েছো যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবো? আমি কি আর বুঝি না সব মতলব। আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ! কাজ!!

কার্লো আমাকে সোশ্যালিজম বোঝাতো। বুঝতে না পারলে বলতো, বৃটিশ কমরেডরা বুঝতে পারে আর তুমি পারো না?

বকর বকর করে কত কি বলে যেত। কিন্তু সবচেয়ে চ্যাঁচাতো রান্না করার সময়। এই বাড়িতে আমাদের নিজেদের রান্না করতে হ'ত। কার্লো রান্না করবার সময় বাড়ি মাথায় করতো।

—র‍্যাশন কার্ড কোথায়! কই মাংস? দুদিনে সব মাংস ফুরিয়ে গেল? আজ তা'হলে টিনের মাছ হবে? টিনের মাছ খেয়ে খেয়ে মুখ তো পচে গেল। আর ভালো লাগে না ছাই। কই পেঁয়াজ নেই দেখছি, সর্বনাশ হয়েছে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে যে।

চট করে দোকানে গিয়ে পেঁয়াজ নিয়ে আসে। তার পর বলে,

পেঁয়াজ তো ছিলই—নুন নেই। না, তাও আছে! নারকেল কোথায়? শুকনো নারকেল না হ'লে যে ছাই চলবে না!



কার্লো সমস্ত রান্নায় শুকনো নারকেল ছড়াতো। আমি বল্‌টু এবং মিস্টার বোস ওর রান্নার সময় নজর রাখতাম। অনেক সময় ওর নারকেল দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বল্‌টু এবং মিস্টার বোস ওর উপর বলপ্রয়োগ করতেন। কার্লো ডাল, ভাত, মাংস, মাছ—সমস্ত খাদ্যে, এমন কি ফ্রুট স্যালাড-এ পর্যন্ত নারকেল না দিয়ে থাকতে পারতো না। বল্‌টু আর কার্লোর মধ্যে নানা ব্যাপারে ভাব ছিল, বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু রান্নার সময় তারা শত্রু হয়ে দাঁড়াতো। বল্‌টু বলতো, ফের যদি মাছে নারকেল দিয়েছ তো···কার্লো বলতো, দেব না কেন? আমাদের দেশে সমস্ত রান্নাতেই নারকেল দিয়ে থাকে। বল্‌টু বলতো, তা হোক। রাবণের দেশে কে কি খায় তার হিসাবের প্রয়োজন নেই। নারকেল দেবার বিরুদ্ধে আমরা তিনজন আছি—আর সপক্ষে আছ একা তুমি। কার্লো বললো, ঐ তো তোমাদের মনটা ডেমোক্রেসির ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। রান্না ব্যাপারটা মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। ওটা একটা আর্ট।

মিস্টার বোস প্রতিবাদ করতেন। বলতেন, গোলমাল ক'রো না। পাশের বাড়ির লোকেরা কি মনে করবে? কিন্তু গোলমাল থামতো না। পাশের বাড়ির লোকেরা কিছু বলতো না কিছু মনে করত কিনা জানতে পারিনি। রান্নাটা আর্ট কিনা জানি না, তবে যে রাঁধে সে যে ডিক্টেটর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিছুটা আর্টিস্ট তারা সবাই। অন্যের কথা তারা শুনতে স্বভাবতই নারাজ। বিশেষ ক'রে রেস্তোরাঁর রাঁধুনীদের কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে জর্জ অরওয়েলের প্যারিসের অভিজ্ঞতা। তাঁর বর্ণনা একটু তুলে দিচ্ছি—আশা করি লণ্ডন প্রসঙ্গে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ লণ্ডনেও রেস্তোরাঁ আছে, আর 'প্যারিস

থেকে লণ্ডনের দূরত্ব ওড়া-পথে মাত্র দুশো দশ মাইল। জর্জ অরওয়েল লিখেছেন :

রান্নাঘর আরো নোংরা। কথাটা বলার জন্যেই বলা নয়, একেবারে সত্যি কথা এটি যে একজন ফরাসী পাচক সূপে থুথু ফেলবেই—অবশ্য তা যদি তাকে নিজে খেতে না হয়। সে একজন আর্টিস্ট কিন্তু পরিষ্কার রাখা তার আর্টের বিষয় নয়। বলা চলে সে বেশি নোংরা, কারণ সে আর্টিস্ট। খাদ্যকে চকচকে ঝকঝকে দেখানোর জন্য নোংরাভাবে সেগুলো নাড়াচাড়া করতেই হয়। একটি মাংসের টুকরো (steak) যখন প্রধান পাচকের কাছে পরীক্ষার জন্য আনা হয়, সে কখনো কাঁটা দিয়ে সে মাংসের টুকরোকে নাড়াচাড়া করে না। সে আঙুল দিয়ে সেটাকে উঠিয়ে ধপ করে ফেলে দেয়, আঙুল ডিশের ওপর ঘুরিয়ে নিয়ে জিভ দিয়ে আঙুলটাকে চাটে—ঝোল কেমন হয়েছে বুঝবার জন্য, আবার আঙুলগুলো ঝোলে ডুবিয়ে চাটতে চাটতে একটু দূরে গিয়ে ডিশটিকে দেখে। যেমন করে একজন শিল্পী দেখে তার তৈরি সৃষ্টিকে। তার পর এসে মাংসের টুকরোর উপর আঙুল দিয়ে আলতোভাবে চাপ দেয় তার মোটা লাল আঙুল, যা সে সকালে অন্তত একশোবার চেটেছে। যদি খাদ্যটা মনমতো হয় তাহলে সে একটা কাপড় দিয়ে ডিশ থেকে আঙুলের ছাপ ঘসে-মুছে দিয়ে ডিশটিকে ওয়েটারের হাতে তুলে দেয়! ওয়েটারের আঙুলও ঝোলে লাগে, যে আঙুল সে সকাল থেকে হাজার বার ব্রিলিয়াণ্টাইন মাখানো চুলের মধ্যে দিয়েছে। প্যারিসে যখনই দামী খাবার কেউ খায় তখনই বুঝতে হবে তার খাবার এমন ভাবে তৈরি হয়েছে। খুব সস্তা রেস্তোরাঁয় অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা—সেখানে খাবারের জন্য এতখানি যত্ন নেওয়া হয় না। সেখানে কড়াই থেকে ডিশে কাঁটা দিয়ে খাদ্য ফেলা হয়। হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে যত বেশি দাম খাদ্যের তত বেশি নোংরা, ঘাম এবং থুথু খেতে হয় খরিদ্দারকে।

জর্জ অরওয়েলের আরো বর্ণনা আছে প্যারিসের হোটেলগুলি

সম্পর্কে। তবে একটি কথা বেশ বোঝা যায় যে, পাচক একজন শিল্পী। আমাদের কার্লোও ছিল শিল্পী। কিন্তু কার্লো অন্যকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কিছু করত না—সে নিজের জন্যই রান্না করতো এবং ভাবতো তার নিজের যখন ভালো লাগে নারকেল দেওয়া খাবার, তখন অন্য সবাইকারও তা ভাল লাগতে বাধ্য। বহু ছবি আঁকিয়েদের মধ্যেও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। যেন তাদের আঁকা ছবি ভাল লাগতেই হবে সবাইকে। যারাই তাদের আঁকা দেখে বলে না, ওহো কী সুন্দর! তারাই অসংস্কৃত। আর্টের সাধু বেলায় অসাধু হয়ে বলা হয়তো সম্ভব দু-চারটে মিথ্যে কথা কিন্তু খাদ্যের বেলায় তা চলে না, খাদ্য যে নিজেকে খেতে হয়।

অতএব কার্লোর বিরুদ্ধে লাগা গেল। নারকেল সমস্ত ডাস্টবিনে ফেলে দিতাম। ওখানে ডেসিকেটেড ককোনাট বলে শুকনো নারকেল পাওয়া যেত, প্যাকেটে করা। কার্লো নারকেল না পেয়ে ক্ষেপে যেতো—আমাদের গালাগাল করতো। আমরাও নীরব থাকতাম না।

অবশ্য পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থাতে ভেবে দেখেছি ঐ সামান্য ব্যাপার নিয়ে চ্যাঁচানোর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। আমার মনে হয়, মানুষ ঝগড়া করতে ভালবাসে, তাই তারা একটা না একটা বিষয় খুঁজে নেয়। কার্লোর সঙ্গে ঝগড়ার বিষয় ছিল রান্না এবং রাজনীতি, আমাদের বহু পরিচিত লোক আছেন যাঁদের সঙ্গে আমরা বলি বন্ধুত্ব আছে, তাঁদের সঙ্গে হয়তো সারাজীবন নানা বিষয়ে তর্কই করে এসেছি।

বল্টুর বান্ধবী ছিল একজন। ইংরেজ কিংবা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হবে—কখনো উৎসাহ প্রকাশ করিনি সে ব্যাপারে। তার নাম ছিল বারবারা। আমাদের বাড়িতে সে প্রায় রোজ ডিনার খেত। খুব হৈ-হৈ করে গল্পগুজব করতো, ক্রমাগত সিগারেট টানতো, আর ব্রীজ খেলায় প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করতো। বারবারার জন্য আমাদের মাংসের র‍্যাশন এবং অন্য সমস্ত র‍্যাশন কিছুটা কম পড়তই কিন্তু মিস্টার বোস কিছু বলতেন না। মিস্টার বোস এমন অত্যাচার অনেক

সহ্য করতেন। সবচেয়ে বেশি একবার সহ্য করতে হয়েছিল, যেবারে আমরা এক অভিনেতা আর এক অভিনেত্রীর পাল্লায় পড়েছিলাম।

অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দুজনেই বাঙালী—দুজনেই আমাদের সকলের অপরিচিত। একদিন এসে হাজির—বল্টু কোথায়? বল্টু ঘোষ তখন ছুটিতে স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে গেছে—সে নাকি অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে এ বাড়িতে নেমন্তন্ন করে গেছে। দু দিনের জন্য। আমাদের কিন্তু বল্টু জানায়নি কিছু।

দু দিনের জন্য—অতএব মিস্টার বোস বললেন থাকতে। দু মাস হলেও মিস্টার বোস অস্বীকার করতে পারতেন না। দু দিনের জন্য—কিন্তু দু দিন আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। স্টেজে অভিনেতা যখন দশ মিনিট পরে দাড়ি-গোঁফ পরে এসে বলেন, দশ বছর পার হ'ল বল কিবা সংবাদ তোমার। আমরা তখন সেটাকে মেনে নিই। আমরা ধ'রে নিই, এই দশ মিনিটে দশ বছর পার হয়ে গেল। অভিনেতার গলার আওয়াজ, চেহারা ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে আমরা বাহবা দিই। ভাল অভিনেতা বলে আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু যে অভিনেতা পনর দিন একটি বাড়িতে এসে থেকে ভান করে যে মাত্র দু দিন সে আছে, তাকে আরো বড় অভিনেতা বলতে হয়। অভিনয় শখ করে দেখতে গিয়ে আমরা পয়সা দিই—কিন্তু অভিনেতা শখ করে বাড়িতে এসে জুটলে তার জন্য খরচ দিতে কুণ্ঠিত হই। হয়তো সেটা অন্যায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে ব্রেকফাস্টের সময় বেকন নেই, জ্যাম বা জেলি নেই দেখলে দুঃখ হ'ত আমাদের এবং ভাবতাম, কবে এই অভিনেতা এবং অভিনেত্রী বিদায় নেবেন। তাঁদের ভদ্রভাবে বাড়ির সদর দরজা দেখিয়ে দেবার প্রস্তাব করাতে মিস্টার বোস আমাদের বলতেন, উহু! আমরা চুপ করেই থাকতাম। মিস্টার বোসকে ব্যথা দিতে আমরা চাইতাম না। আমরাও অভিনয় করতে শিখলাম—প্রত্যেক দিন আমরা বলতে শুরু করলাম, আপনারা এখানে আছেন সে আমাদের ভাগ্য। এমন সুযোগ আর আমাদের জীবনে

আসবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কার্লো বলতো, ওদের জীবনেও এমন সুযোগ আর জুটবে না। কার্লো রান্নায় নারকেল দেওয়াতে একদিন অভিনেত্রী আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু আমি এবং মিস্টার বোস বলেছিলাম, নারকেল তো ভালই। প্রত্যেক রান্নাতেই নারকেল দেওয়া উচিত। নারকেলে ভিটামিন এ থেকে এস পর্যন্ত সমস্ত আছে। তা ছাড়া প্রচুর প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ক্যালরি আছে। ক্যালরির পরিমাণ প্রায় হাজার পাঁচেক !

এই সমস্ত বক্তৃতা, দৈব না নারকেল কিসের ফলে জানি না। পনর দিন পর তাঁরা বিদায় নিলেন। কেন নিলেন জানি না—না নিলেও পারতেন। আমাদের কিছু অসুবিধে হ'ত—কিন্তু তাঁদের সান্নিধ্যে আসায় আমাদের মনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আস্তে আস্তে আমাদের সহ্যশক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল ! তাঁরা অমনভাবে না এসে পনর দিন থাকলে আমাদের সহ্যশক্তি অত হ'ত কিনা সন্দেহ।

আমাদের এভনমোর রোডের ফ্ল্যাটটি অতি চমৎকার ছিল। এর ভাড়াও বেশ বেশি ছিল—মাসে ছত্রিশ পাউণ্ড। এর উপরে ইলেকট্রিক, গ্যাস ইত্যাদি মিলে আরো বেশ কিছু খরচ হ'ত, আর ছিল একজন ঝি। এই ঝিকে আমি কখনো দেখিনি। সে দুপুরে আসতো এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার জন্য সপ্তাহে চার পাঁচদিন। সে পেত মাসে ছ' পাউণ্ড। বাসন ধুতো আর ঘর পরিষ্কার করতো। তার কাছে একটা চাবি ছিল ফ্ল্যাটের। সে কখন আসতো কখন যেতো কেউ জানতাম না। ঝিটি আরো চার পাঁচটি বাড়িতে কাজ করতো। লণ্ডনে ঝি পাওয়া বেশ কঠিন। আজকাল মেয়েরা অফিসে, দোকানে, বাসে, ট্রেনে রেস্তোরাঁতে কাজ নিতে চায়। এই মেয়েরাই হয়তো আগে ঝি-গিরি করতে পারলে খুশি হ'ত। কিন্তু ঝি-গিরি কাজটা আমাদের দেশের ঝি-গিরির চাইতে অনেক কম কষ্ট সাপেক্ষ হলেও এ কাজের স্থিরতা নেই, উন্নতির আশা নেই। এর উপরে প্রায়

সকলেই একটা-না-একটা কাজ পেতে পারে বলে অনেকের পক্ষেই ঝি পাওয়া কঠিন। তা ছাড়া খরচ বেড়েছে বলে অত মাইনে দিয়ে তাদের রাখার ক্ষমতাও খুব কম লোকেরই আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সরকারী অফিসারদের কথা স্বতন্ত্র। এঁরা সপ্তাহে দশ বারো এমনকি পনর পাউণ্ড পর্যন্ত বাড়িভাড়াই কেবল পেয়ে থাকেন তা নয়, এঁদের চাকর, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই ওখানে যাবার জাহাজ ভাড়া পেয়ে থাকেন। ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য, বাড়ি গরম করবার জন্য ইত্যাদি নানারকম অ্যালাউয়েন্স পেয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের বাড়ি কেবল গরম থাকে তা নয়, থাকে সর-গরম। তা ছাড়া অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার আছেন যাঁরা খুব সস্তায় মদ এবং সিগারেট কিনতে পারেন। এর ফলে তাঁদের চোখে লণ্ডন মনে হয় স্বপ্নের দেশ, প্রাচুর্যের দেশ। এঁরা টেলিভিশন দেখেন বাড়িতে, গাড়ি নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে যান। মেজো ব্যান্যার্জি হয়তো বলতে পারতো, প্রায় চাকর-বাকরদের সমান স্ট্যাণ্ডার্ড।

এই সমস্ত অফিসারদের কথা বললাম এই জন্য যে এঁদের জন্যই কার্লোদের মতো বহু কেরানী কাজ করতে প্রেরণা বোধ করে না। ইংল্যাণ্ডে সংগৃহীত ভারতীয় কেরানীরা বাড়িভাড়া পায় না, গ্যাসের খরচা পায় না, এমন কিছুই পায় না যে কাজ করবার প্রেরণা পেতে পারে। সম্মান তো নেই-ই। সপ্তাহে ছ সাত পাউণ্ড মাইনে থেকে বাড়িভাড়া দিতে এবং খেতেই পাঁচ পাউণ্ড খরচা হয়ে যায়। যা সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়ে হীনভাবে জীবন যাপনই সম্ভব। সে জন্যই ব্লেনিম ক্রেসেন্টের মতো অস্বাস্থ্যকর জায়গায় গাদাগাদি করে লোক থাকে। সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য কি অসামান্য কষ্ট সহ্য করে। শারীরিক কষ্ট সহ্য করা হয়তো তবু সম্ভব, কিন্তু মানসিক কষ্ট সহ্য করা কঠিন। কারণ অফিসারেরা পাঁচ গুণ মাইনে পান বটে এবং ছুটিও প্রচুর তাঁদের, কাজ বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। কেরানীদের সঙ্গে একই কাজ করতে গিয়ে মাইনের এই বিরাট অসাম্য কেরানীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। এর কোনো একরকম সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। কারণ যতই

দিন যাবে ততই এরকম অব্যবস্থায় কাজের পরিমাণ কমে যেতে থাকবে।

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে অফিসারদের বিশেষ কিছুই দোষ নেই। ভালোভাবে থাকা পরা সকলেরই কাম্য। তাঁরা তা পেলে বলবার কিছু থাকে না। কিন্তু ঐ নিয়মই ভুল—যে নিয়মে একদলকে মানুষ বলেই মনে করা হয় না। ব্যক্তিগত ভাবে অনেক ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে মিশেছি—প্রায় প্রত্যেকেই ভালমানুষ। তবে খারাপ লোকও দেখেছি। একজন অফিসারের ফ্ল্যাটে গিয়েছি বেড়াতে। সেখানে বেসিন থেকে গরম জল পড়ছিল বিরাট তোড়ে। গ্যাস জ্বলছে। সে জল বেসিন দিয়ে ড্রেন পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনো কাজে লাগছে না। আমি দেখে বললাম, কলটা বন্ধ করে দিলেই হয়? অফিসার বললেন, প্রয়োজন নেই—ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট গ্যাসের বিলের টাকা দেবে—পড়ুক গরম জল।

বিদেশী মুদ্রাসঙ্কট এরকম নানা অপচয়ের ফলেই হয়েছে।

এভনমোর রোডে যাবার অনেকদিন আগেই নাসের এবং ফীবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল টলবট রোডের একটি বাড়িতে। সেখানে তারা থাকতো। নাসের আহমেদ ভারতীয়, ফীবি অস্ট্রেলিয়ান। স্বামী এবং স্ত্রী। ফীবি আমাকে বিলিতি নাচ শেখাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শিখতে পারিনি। ওদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বেশ রসিক তারা। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে কাউকে নেমন্তন্ন করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। এ বাড়িতে তার সুযোগ পাওয়া গেল। এক শনিবার তাদের নেমন্তন্ন করলাম। কিন্তু এখনো মনে হলে কষ্ট হয়, ফীবি সেদিন মোটেই খেতে পারেনি। দোষ আমার সবটা নয়—দোষ খানিক ছিল কার্লোর খানিকটা আমার, আর খানিকটা ছুটো কাঁচা লঙ্কার।

আমার কাছে যখন কার্লো শুনলো ছুজনকে নেমন্তন্ন করেছি—তাদের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ান মেমসায়েব, তখন সে একেবারে উন্মাদ হ'য়ে গেল। ছু তিন দিন থেকে কেবলি বলতে লাগলো, আমাকে রান্না করতে দিও, সব ঠিক হয়ে যাবে। বল্টু আমাকে বলল, খবরদার

কার্লোকে রান্না করতে দিও না। ও সব মাটি করবে। বল্টু নিজেই রান্না করে দিত, কিন্তু কোথায় কাজ থাকায় বেরিয়ে গেল।

কার্লো রান্না করবেই এই ভয়ে আমি সমস্ত শুকনো নারকেল সরিয়ে ফেললাম রান্নাঘর থেকে।

কার্লো ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল নিশ্চয়। রান্নার সময় দেখি ওর ওভারকোটের পকেট থেকে এক বিশাল প্যাকেট শুকনো নারকেল এনে রান্নায় মেশাচ্ছে।

আমার কোন বারণ শুনলো না।

মাংস ডাল তরকারী ও রান্না করলো।

ফীবি আর নাসের এল বিকেলবেলা। নানারকম গল্প গুজব হ'ল। তারপর খাওয়ার পালা।

কার্লো খুব যত্নের সঙ্গে পরিবেশন করলো।

ভাত ডাল খাওয়া গেল কোনমতে। মাংসও ভালই রান্না করেছিল কার্লো। কিন্তু দেখি ফীবির চোখে জল।

ছুটো লঙ্কার ঝাল। ফীবির খাওয়া হ'ল না।

আমরা অত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত রেস্তোরাঁয় গেলাম। আমাদের পাড়ার রেস্তোরাঁ আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক মিনিটের পথ। আডয়ন সিনেমার দোতলায়।

কেনসিংটন হাই স্ট্রীট দিয়ে কিছুটা দূরেই কেনসিংটন গার্ডেন্স। হাঁটা পথে মিনিট পনর। কেনসিংটন গার্ডেন্স পার হ'লেই আবার হাইড পার্ক। ছুটোই পাশাপাশি লাগানো পার্ক। বেজওয়াটার রোডের পাশ দিয়ে চলে গেছে টিউব স্টেশনের সারি।

একটা টিউব স্টেশন—নাম ল্যাংকাস্টার গেট। তার কাছেই হাইড পার্কে একটা কবরখানা। কবরখানাটি আমি কখনো লক্ষ্য করিনি।

একদিন আমার সদ্য পরিচিত অবতার সিং মারওয়াহা বললো, কবরখানাটি কুকুরদের জন্য। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। ইংরেজরা বিশেষ ভাবে কুকুরভক্ত, এবং মনে হয় সে কারণেই হয়তো কুকুরেরাও ইংরেজ ভক্ত! আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজ ভক্তদের কুকুর বলেই সম্বোধন করা হ'ত। এতে কারুর কারুর নিশ্চয় রাগ হ'ত। কিন্তু ইংরেজ কুকুর বলে গালাগাল দেয় না। কুকুর ইংরেজদের এতই প্রিয় যে তাদের প্রিয় নেতা চার্চিলকে বুলডগের মতো দেখতে এ কথাটা ইংরেজরা নিজেরাই বলে থাকে। এই কবরখানাটি কোন ধর্মের কুকুরদের কবর দেয় জানি না। এদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট আছে কি না জানি না। তবে ধর্মীয় পার্থক্য না থাকলেও টাকার পার্থক্য নিশ্চয় আছে। বড় কবর এবং ছোট কবর দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কুকুররা যেমন নানা জাতের তাদের কবরগুলোও তাই। একটি কুকুরের কবরের প্রস্তরফলকের উপরে একটি বাণী :

In Loving Memory of Puskin
My Gentle Little Friend
And Companion for 11 years
Sadly Missed
Sleep Little One Sleep
Rest Gently Thy Head
As Ever Thou Didst At My Feet
And Dream That I Am Anear.

কুকুরপ্রিয়তা ইংল্যাণ্ডের সর্বত্রই—আবার এই কুকুরদের বিরুদ্ধে পুলিস সর্বদা খড়্গহস্ত। কুকুরদের যেমন কবর আছে, কুকুরদের চিকিৎসার যেমন বিশেষ ব্যবস্থা আছে হাসপাতালে—তেমনি কুকুরদের বিরুদ্ধে নোটিসও আছে। প্রায় প্রতি বাড়িতে কুকুর থাকলেই গেটে লেখা থাকে, 'কুকুর আছে, সাবধান!' আর সে কুকুর কামড়াতে পারুক

বা না পারুক তার সম্পর্কে অমনি লেখা না থাকলে কুকুরকে ঠিকমতো সম্মান দেওয়া হয়নি বলে বহু কুকুর রাগ করতে পারে। আমি কখনো কুকুরকে দেখিনি কোনো মানুষকে কামড়াতে—কামড়ালেও সেটা খবর দেবার মতো কিছু হ'ত না। তবে কুকুর যে মানুষকে তাড়া করে তা দেখেছি। প্রভাস চৌধুরী এবং অরুণ



পালিতকে একবার দু ডজন কুকুরে তাড়া করেছিল। তখন আমরা ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে থাকতাম। ইংরেজদের নববর্ষে কোনোরকম স্ফূর্তি করতে না দেখে—এমনকি তারা একদিনও ছুটি পায় না একথা শুনে অরুণ এবং প্রভাস স্থির করেছিল, লণ্ডনে তারা বাঙালী মতে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করবে।

সেদিন গরমও পড়েছিল। প্রভাস এবং অরুণের ধুতি-পাঞ্জাবি ছিল, তারা তাই পরে বেরিয়েছিল নববর্ষের উৎসব করতে। ওদেশে হালখাতা হয় না দেখে ওরা হয়তো দমে গিয়েছিল, কিন্তু ফেরবার সময় তাদের যে হাল হয়েছিল, তা আর কহতব্য নয়। অদ্ভুত ব্যাপার দেখলে কুকুরেরা চেঁচায় এবং তাড়া করে—সেটাই কুকুরের ধর্ম। অরুণ এবং প্রভাস এরা দুজনে কেমন করে যেখানে যাবার কথা, গিয়েছিল, তা জানি না। কিন্তু তারা ফিরেছিল দৌড়ে। তাদের পেছনে ছিল তাড়া-করে আসা ডজন দুয়েক নানা জাতের কুকুর। কুকুরেরা ব্লেনিম ক্রেসেণ্ট পর্যন্ত তাড়িয়ে এনেছিল। অরুণ এবং প্রভাস দুজনেই পনর মিনিট একটি কথা বলতে পারেনি, এত তারা হাঁফাচ্ছিল। ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, লণ্ডনে বাঙালীমতে নববর্ষ করবার আগে কুকুরদের কাছ থেকে অন্তত পারমিট নিয়ে রাখতে হবে।

কুকুরেরা ডাকপিওনদের পছন্দ করে না—প্রতি বছর কয়েক শো ডাকপিয়ন কুকুরের কামড় খায়। কুকুরেরা ডাকপিয়নদের কামড়ায় সম্ভবত কুকুরদের নামে কোন চিঠি থাকে না বলে। কুকুরেরা মানুষের

সঙ্গে কথা বলতে পারে না বলে কেবল কামড়ায়। যেদিন কুকুরদের নামে চিঠি আসা শুরু করবে সেদিন থেকে তারা ডাকপিয়নদের কামড়াবে না।

কুকুরদের মানুষপ্রীতির অনেক গল্প আছে। তবে সবচেয়ে ভাল লাগে আমার জেম্‌স থারবারের গল্পটি। একটি কুকুর তার প্রভুর বাড়ি পাহারার কাজে গাফিলতি করতো—রাত্রে বাড়ি পাহারা না দিয়ে সে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত। এমন ক'রাত্রি কাটাবার পর প্রভুর বাড়িতে এক বিরাট চুরি হ'য়ে গেল। সকালের দিকে কুকুর বাড়িতে ফিরে দেখতে পেল কী কাণ্ড ঘটে গেছে! তখন সে লজ্জায় কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। তারপর হঠাৎ সে ছুটে গেল বাড়ির তিনতলায়। জানালা দিয়ে সে লাফিয়ে আত্মহত্যা করলো।



কুকুরের এতখানি বোধ থাকা অসম্ভব হয়তো। জেমস থারবার ঠিক বলেছেন, কিংবা ঠিক বলেন নি, কিন্তু প্রত্যেকটা কুকুর যে পৃথিবীর অন্য যে কোনো কুকুরের চাইতে বেশি চালাক, বেশি কথা বোঝে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। আমি যত কুকুর প্রভুর (কুকুরের প্রভু) সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁদের সবাইকার কুকুরই সবচেয়ে চালাক। (যাঁরা লজিক পড়েছেন তাঁরা এ ব্যাপারে দয়া করে মন্তব্য করবেন না)। আমি এবং দীপক ব্যানার্জি একবার এমনি এক কুকুর-প্রভুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। কুকুরটির রঙ ঘোরতর কালো, প্রভুটি খাস বিলিতি এবং তদনুযায়ী সাদা। আমি এবং দীপক প্রায়ই বিকেলে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। কারণ, লণ্ডনের রাস্তায় ঘোরা একটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার—কারুর কারুর কাছে ওটা একটা নেশার মতো। আফিঙ কোকেন বা মারিউয়ানা হয়তো চট করে ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু লণ্ডনে গ্রীষ্মের সবুজ বিকেলে রোদ্দুরে মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়ানো একবার আরম্ভ করলে ছাড়া শক্ত। শীতেও লণ্ডনের পথে পথে আর পাড়ায় পাড়ায় আমরা প্রচুর হেঁটেছি। হয়তো নেশা আমাদেরও হয়েছিল।

কুকুর-প্রভু বললেন, আমার এই কুকুরটির মতো চালাক কুকুর পৃথিবীতে আর নেই। ভয়ানক চালাক এটি। (পরিচয়ের পর্বটা ইচ্ছে করেই বাদ দিলাম, এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।)

দীপক জিজ্ঞেস করলো, এটির নাম ?

কুকুর-প্রভু এবার চুপ-চাপ। বললেন এর নাম এই (একটু ইতস্তত ভাব) মানে বুঝছো তো এর রঙ কালো কি না!

আমি বললাম, এর নাম কি ?

কুকুর-প্রভু বললেন, এর নাম মানে···ব্ল্যাকি। কথাটা বলে একটু লজ্জাই পেলেন। কারণ, নিগ্রো এবং ভারতীয়দের ওরা ব্ল্যাকি বলে। তবে এতে দোষের কি, তাতো বুঝলাম না। ইংরেজদের আমরা সাদা বলি—কারণ ওরা সাদা, আমাদের ওরা কালো বলে, কারণ আমরা কালো।

কুকুর-প্রভু আরো বললেন, এমন কুকুর জগতে একটিই হয়—আর আমার ভীষণ বাধ্য এটি।

আমাকে বললেন, আমাকে মারো, দেখবে একটা মজা। কুকুর খ্যাঁক করে উঠবে আর তোমাকে কামড়াতে চেষ্টা করবে।

আমি কুকুর-প্রভুকে আস্তে মারবার চেষ্টা করলাম। কুকুরটা খ্যাঁক করে উঠলো। কামড়াতে চেষ্টা করলো।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুকুরের পরিচয় তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ, কুকুর-প্রভু এবারে আমাকে মারবেন স্থির করলেন। এবারে কুকুর নাকি একটুও প্রতিবাদ করবে না! ভদ্রলোক আমার পিঠে ভয়ানক জোর এক ঘুষি মারলেন।

কুকুরটা নীরব। প্রভুকে সে এ ব্যাপারে সমর্থন করে, বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

পিঠের ব্যথা সারতে লেগেছিল তিন দিন।

এর পর কুকুর-প্রভু দীপকের দিকে নজর দিলেন। দীপক ততক্ষণ প্রায় সিকি মাইল চলে গিয়েছে। কুকুর মহাপ্রভু বললেন, ওকে ডাকো, ওকেও দেখাই।

আমি বললাম, আমি ওকে বলব। বেশ ভাল করেই বলবো।

দীপক কেবল বলেছিল, কুকুর সম্পর্কে সায়েবদের সঙ্গে আর কক্ষনো আলোচনা করা হবে না।

আমরা পূর্বদেশের লোক, তারা পশ্চিমের। তাদের সঙ্গে আমাদের কী তফাত, প্রমথ চৌধুরী তার একটি হিসাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রায় সব ব্যাপারেই আমাদের সঙ্গে সায়েবদের পার্থক্য। অতএব একেবারে কোন বিষয়ে আলোচনা না করাই হয়তো ভাল!

ইংরেজদের সঙ্গে তাই রাজনীতি আলোচনা খুব কম করেছি। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই আবহাওয়ার কথা আলোচনা করেছি যার মধ্যে এ যাবৎ রাজনীতির ছিটেফোঁটাও ছিল না—কিন্তু একবার খবরের কাগজে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যে রাশিয়ানরা আবহাওয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে। ইংরেজরা বেশ ক্ষেপেছিল এ ব্যাপারে—অন্তত আমার পরিচিত দু একজন ভয়ানক অগ্নিশর্মা হয়েছিল। ইংরেজদের এতদিনকার একটা নিরাপদ আলোচনার জিনিসও যদি রাশিয়ানরা নষ্ট করে দেয় তাহলে আর সর্বনাশের বাকী রইল কি?

কার্লো রাজনীতি ছাড়া আলোচনা করত না। আমাদের বাড়িতে আমরা নানারকম খবরের কাগজ নিতাম, কিন্তু ডেইলি ওয়ার্কার নেওয়া হয়নি কখনো। একদিন কার্লো বললো, ঐ কমিউনিস্ট বাঁদরদের কাগজও পড়া উচিত কারণ ওদের কথা ভাল করে না জানলে ওদের ভাল করে আক্রমণ করা শক্ত।

আমরা স্থির করলাম ডেইলি ওয়ার্কারও রাখতে হবে। কাগজ-ওয়ালাকে বলেও এলাম। কিন্তু এক কপির বেশি কেনা হয়নি। কেন বলছি।

যেদিন বাড়িতে ডেইলি ওয়ার্কার আসবার কথা সেদিন হঠাৎ কার্লোর দরজা ধাক্কাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আমি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?

কার্লো বললো, নীচে গিয়ে দেখবে কী ব্যাপার!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বলই না ব্যাপারটা কি—কিন্তু কার্লো ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে বলতে লাগলো, নিজে গেলেই বুঝতে পারবে।

তাড়াতাড়ি নিচে গেলাম।

হলের টেবিলে আমাদের কাগজ থাকতো। দেখলাম সমস্ত কাগজ আস্ত আছে—কিন্তু ডেইলি ওয়ার্কারখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। এত ছোট সে টুকরো যে ছাদ থেকে উড়িয়ে দিলে মনে হতে পারতো যে স্নো পড়ছে। অতএব একটু অবাক হলাম। সীজার যেমন ব্রুটাসের হাতে ছোরা এবং শক্রমূর্তি দেখে বলেছিলেন, হে ব্রুটাস, তুমিও? আমার অবস্থা তখন অনেকটা সীজারের মতো। হে লণ্ডন, তুমিও!

শুনলাম ল্যাণ্ডলেডি এই কাণ্ডটি করেছেন। ল্যাণ্ডলেডি পোল্যাণ্ডের অধিবাসী। যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ-ষাট হাজার পোল্যাণ্ডের অধিবাসী ইংল্যাণ্ডে এসেছিল—রাশিয়ান এবং জার্মানদের ভয়ে। বিশেষ করে রাশিয়ানরা নাকি ভয়ানক লোক। জানতে পারলাম ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে। ল্যাণ্ডলেডি বললেন তিনি নিজে খুবই গণতান্ত্রিক—তবে কেবল কমিউনিস্ট বিরোধী তিনি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনো খবরের কাগজ পড়াতে আপত্তি নেই—কেবল কমিউনিস্টদের কাগজ ছাড়া। কারণ তাঁর একজন বিশেষ বান্ধবী কমিউনিস্ট-বিরোধী ছিলেন—তিনি নানারকম কাগজ পড়েছিলেন—কনসারভেটিভ কাগজ, কিন্তু কনসারভেটিভ হননি, মোসলের ফাসিস্ত কাগজ পড়েছিলেন অথচ ফাসিস্ত হননি, অ্যানার্কিস্টদের কাগজ পড়েছিলেন কিন্তু অ্যানার্কিস্ট হননি—কিন্তু যেমনি কমিউনিস্টদের কাগজ পড়তে শুরু করলেন অমনি তিনি কমিউনিস্ট হ'য়ে গেলেন। এখন তিনি নাকি ঘোরতর লাল—বিল গ্যালাকার এবং জোসেফ স্টালিন তাঁর গুরু। অতএব তিনি কমিউনিস্ট কাগজ পড়ার বিরোধী। তবে খুব বিরোধী নন, কমিউনিস্টদের কাগজ ছিঁড়ে ফেলা ছাড়া আর কোনোরকম উচ্চাশা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর স্বামী কমিউনিস্ট দু চোখে দেখতে পান না। তিনি যদি কোনো ক্রমে

জানতে পারেন যে এ বাড়িতে কমিউনিস্টদের কাগজ আসে তাহলে তিনি রিভলবার দিয়ে সে কাগজের গ্রাহকদের মেরে ফেলবেন। ল্যাণ্ডলেডি আরো বললেন, তিনি আমাদের বাঁচানোর জন্যই কাগজ ছিঁড়েছেন। যদি কাগজ আস্ত থাকতো, আর তার স্বামী সেটা টের পেতেন যে সেটা ডেইলি ওয়ার্কার, তাহলে আজ খুনোখুনি হয়ে যেত। আমরা কোন প্রকারেই আস্ত থাকতাম না।

নানা কথা—ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর। কার্লো রেগে লাল। কার্লো বললো, কমিউনিস্টদের আমিও পছন্দ করি না—কিন্তু তাদের কাগজ আমাকে পড়তে হয়। কারণ আমি তাদের বিরোধিতা করি।

ল্যাণ্ডলেডি বললেন, বিরোধিতা করবার জন্য লোকে রাইফেল কেনে—খবরের কাগজ কেনে না। কার্লো বোঝাতে যাচ্ছিল রাইফেলের চাইতেও শক্তিশালী হচ্ছে খবরের কাগজ। অসির চেয়ে কলম বেশি শক্তিশালী। আমি এ তর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখালাম না।

আমি আর কার্লো উপরে উঠে এলাম। কার্লো বলতে আরম্ভ করলো যত রাজ্যের মারাত্মক কথাবার্তা। পুলিশ ডাকবে, আদালতে যাবে ইত্যাদি। দেশে আদালত বলে একটা জিনিস রয়েছে। মানুষের অধিকার বলে একটা জিনিস আছে—যে কোনো জিনিস পড়বার অধিকার আছে বৃটিশ আইনে।

শেষ পর্যন্ত কিছু করা হ'ল না। সেই দিনই আমরা নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হলাম। এ সমস্যা আরো গুরুতর। সেই দিন থেকেই শুরু হল ব্যাপারটা।

মিষ্টার বসু বলছিলেন অনেক দিন থেকেই যে তাঁর স্ত্রী আসছেন। ঐ জাহাজে আমারও এক পরিচিত ভদ্রলোকও আসছিলেন। অতএব আমাকে স্টেশনে যেতে হবে। আমার পরিচিত ভদ্রলোক পুলক বসুরও পরিচিত, নাম বিমান বাগচী। আমার উপর ভার পড়েছিল এঁকে লণ্ডনে দু-চার দিনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা। তার পর লণ্ডন থেকে তিনি চলে যাবেন স্কটল্যাণ্ডে।

ওয়াটার্লু স্টেশনে সম্ভবতঃ গাড়ি থামলো। প্লাটফরমে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। গাড়ি এল। বিমান বাগচীকে দেখবার আগেই দেখা হ'য়ে গেল আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। কোলকাতায় ওঁকে দেখলে মাঝে মাঝে কথা বলতে হ'ত। কথা না বললেই ভালো লাগতো।

ইনি আমাকে স্টেশনে দেখে বললেন, এই যে, কী খবর ?

আমি নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই বললাম, খুব ভাল, আপনার কী খবর ?

খবর ভালো তাঁর। কোথায় থাকছেন জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর পেলাম, থাকবার একটি ভাল বন্দোবস্ত করেছেন এবং আমাকে সেজন্য চিন্তা করতে হবে না।

এর পর আমার বন্ধুকে নিয়ে ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে পৌঁছে দিতে গেলাম। মিসেস বোসের সঙ্গে তখন দেখা হ'ল না। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে পৌঁছে কোলকাতার গল্প আর এটা-সেটা গল্প করতে করতে রাত অনেক হ'ল। একটু খিদেও পেল। এমন সময় বিমান বাগচী বললেন, তাঁর সঙ্গে দু টিন রসগোল্লা আছে।

শুনে আনন্দ হয়েছিল প্রচুর কিন্তু চোখের সামনে দুঃখের পরদা নেমে এলো যখন শুনলাম পুলক বসুর বাবা পাঠিয়েছেন কোলকাতা থেকে এবং পুলকের জন্য। এর পরে আর কথা চলে না। দীপক বললো, একটা টিন খাওয়া যাক—একটা টিনেই পুলকের চলে যাবে। আমি এবং আর সবাই সে ব্যাপারে সায় দিলাম।

এক টিন সুন্দর রসগোল্লা কয়েক সেকেণ্ডে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু তাতে লোভটা বেড়েই গেল। আমাদের মধ্যে একজন বললো, পুলক জানে না এই রসগোল্লা তার বাবা পাঠাচ্ছেন, অতএব পুলকের পক্ষে একেবারে রসগোল্লা না পেলেও কোনো ক্ষতির কথা নয়। আমাদের ক্ষতির কথা কারণ রসগোল্লাগুলি আমাদের অধিকারে রয়েছে এখন।

ইতিমধ্যে একজন টিন কাটাবার যন্ত্র দিয়ে দ্বিতীয় টিনটাও খুলে

ফেলেছে। কয়েক সেকেণ্ড কোনো কথা নেই! দ্বিতীয় টিনও ফুরলো।

আমরা পুলককে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলাম, ভাই পুলক, তোমার বাবা তোমার জন্য দু টিন রসগোল্লা পাঠিয়েছিলেন, প্রতিটি রসগোল্লার স্বাদই মনোরম ছিল—এই সংবাদটি তুমি তোমার বাবাকে লিখে জানাবে। যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখিত।

তার পর রাত প্রায় এগারোটায় বাড়িতে ফিরলাম। তখনো এভনমোর রোডের বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। আমাকে দেখে বল্‌টু এবং কার্লো লাফিয়ে উঠলো।

—তুমি?

—কেন, কি হয়েছে? আমার তো আসবারই কথা।

কার্লো বললো, তা তো বটেই, কিন্তু তুমি শোবে কোথায়?

আমি বললাম, মানে? আমার ঘর কি পুড়ে গেছে? আমায় বিছানাতেই থাকবো।

বল্‌টু বললো, তোমার বিছানা? সেখানে কে একজন শুয়ে আছে!

আমার বিছানায়! শুনেই দৌড়ে গেলাম ওপরে।

দরজা খুললাম। ঘর অন্ধকার, আলো জ্বাললাম। দেখলাম।



দেখলাম সেই ভদ্রলোক। তিনি পিট পিট করে তাকাচ্ছেন। ইনিই স্টেশনে বলেছিলেন আমাকে তাঁর জন্য কিছু ভাবনার প্রয়োজন নেই।

—এই যে, এসো এখানে শোবে?

রেগে বললাম, আমি আপনার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারব না।

—তবে কোথায় থাকবে?

মুশকিলের প্রশ্নই বটে! আমি কোথায় থাকব সেজন্য আমারই মাথা ব্যথা হবার বিশেষ প্রয়োজন। মাথা ব্যথা বিশেষ করেই হ'ল। বললাম একটু রাগত স্বরে, হোটেলে থাকবো।

—তা হোটেল কি পাবে এত রাত্রে? এখানেই থাকো না।

—লণ্ডনে সব সময়েই হোটেল পাওয়া যায়।

—হুঁ, তাহ'লে যাও হোটেলেই।

আমি দরজা বন্ধ করে বৈঠকখানায় এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই অদ্ভুত লোকটি কেমন করে এই বাড়িতে এসে আমার ঘরে, আমার খাটে শুলো? কে তাকে এমন অধিকার দিল?

বল্টু বললো, লোকটা সম্ভবত মিসেস বসুর আত্মীয়—ওঁর সঙ্গেই এসেছে!

আমি বললাম, কিন্তু আত্মীয় হোক আর যাই হোক, আমার খাটে কেন?

কোনোক্রমে বল্টু এবং কার্লোর বিছানার অংশ নিয়ে মেঝেতে শুলাম। তিন জন ঠাণ্ডায় যথেষ্ট কষ্টও পেলাম। পরদিন সকালে মিসেস বসুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি হলেন আমাদের রাণীদি।

সকালে কফী খেতে খেতে বলা গেল না। একটু আড়ালে পেয়েই রাণীদিকে বললাম ঐ ভদ্রলোক আপনার আত্মীয় শুনলাম—কিন্তু আমার বিছানা এবং ঘর অধিকার করেছেন কেন বুঝতে পারছি না।

রাণীদি বললেন, উনি তো আমার আত্মীয় নন। জাহাজে আলাপ হ'য়েছে। একসঙ্গে ট্যাক্সিতে বাড়িতে এসেছি সবাই মিলে। এসে শুনলেন আপনি এখানেই থাকেন। যখন শুনলেন আপনি এখানে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, ওর সঙ্গে আমার স্টেশনে দেখা হ'য়েছিল এখানে থাকতে দিতে ওর (অর্থাৎ আমার) আপত্তি নেই।

আমি বললাম, আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে এবং আজই ওঁকে এ বাড়ি থেকে তাড়াব।

কথাটা মিষ্টার বোস শুনে বললেন, আজ থাক। আজ তাড়িয়ে প্রয়োজন নেই। মিষ্টার বোস অত্যন্ত নির্বিরোধ প্রকৃতির ভদ্রলোক।

সেদিন গেল। সকালে বেরুলাম, রাত্রে মণি পালিতের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে ঐ বাড়িতেই অরুণ এবং খুকু পালিত আর কানুনগোর সঙ্গে গল্পগুজব করে, প্রশান্ত ঠাকুরের বাজানো পিয়ানো শুনে যখন ফিরলাম তখন রাত এগারোটা।

অতিথি তখনো যাননি। আমার ঘর তিনি অধিকার করে আছেন তখনো।

পরদিন নিশ্চয়ই তাড়াতে হবে।

কার্লো স্থির করেছে তাড়াতেই হবে। সিনেমা অভিনেতা অভিনেত্রী-দের অভিজ্ঞতার পরই স্থির করেছিলাম এরকম আর চলতে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞার জোর পরীক্ষা করতে চাইলাম।

বিকেলে কার্লো নিয়ে এলো একটি সাপ্তাহিক কাগজ। এর নাম লণ্ডন উইকলি অ্যাডভার্টাইসার। এই কাগজ ভর্তি নানা জাতের বিজ্ঞাপন। বাড়িভাড়া, ঘড়ি বিক্রি, জমি কেনা-বেচা, নাচ গান ইত্যাদি যাবতীয় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এই সাপ্তাহিক কাগজটির মধ্যে বোর্ডিং-হাউসের বিজ্ঞাপনও থাকে। আমরা চার-পাঁচটা বোর্ডিং-হাউসের টেলিফোন নম্বর নিয়ে ফোন করতে আরম্ভ করলাম। দু-তিনটেতে ব্যর্থ হয়ে চতুর্থটিতে সফল হ'লাম। সঙ্গে সঙ্গে ফোনেই স্থির করে ফেললাম। তারপর আমাদের অতিথি মশাইকে এসে বললাম, মশাই, আপনার জায়গা স্থির হয়েছে।

তিনি অবাক এবং অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও ট্যাক্সি ডাকলাম টেলিফোনে। ট্যাক্সি এসে গেল তিন মিনিটে। এরপর তিনি বুঝলেন তিনি সত্যিই চলে গেলে আমরা খুশি হই। ট্যাক্সি ডাকার আগে পর্যন্ত ইনি বুঝতে পারেন নি।

আমার ঘরে আমার খাটে এর আগেও আর একজনকে দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। ভালও লেগেছিল। একদিন ক্লাস থেকে রাত্রে ফিরে দেখি আমাদের এক ভূতাত্ত্বিক বন্ধু সমীর দাসগুপ্ত আমার বিছানায়। অ্যামেরিকা যাবার পথে লণ্ডনে নেমেছে। এখানে সোজা চলে এসেছে। আগে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। একেবারে কোলকাতা থেকে উড়ে এসেছে।

পরদিন ওকে নিয়ে লণ্ডন দেখতে বেরুলাম। এদিকে যাই ওদিকে যাই। সমীর খুব অবাক। টিউবে চড়ে ওর খুব আনন্দ এবং কিছুটা বিস্ময়।

নানারকম যন্ত্রপাতি—অটোম্যাটিক মেশিন দেখলো আগ্রহের সঙ্গে। বললো দেশটা কী উন্নত। তবে বেশি সময় ছিল না বলে



সব দেখানো সম্ভব হ'ল না—বললাম ফেরবার সময় সব দেখিস। কয়েক বছর পর অ্যামেরিকা থেকে ফিরছে ও। লণ্ডনে এসে নেমেছে। আমাদের সঙ্গে সর্বত্র বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনোরকম আশ্চর্য হচ্ছে না। অথচ লণ্ডনে অটোম্যাটিক যন্ত্রের সংখ্যা নানা দিকে বেড়ে গেছে। চকোলেট, সিগারেট, মাখন, চা, ডিম এ সমস্তই অটোম্যাটিক মেশিনে পাওয়া যাচ্ছিল তখন। সমীর উলটো রকম কথা বলছে, এই তোদের লণ্ডন! এই রকম বাজে স্ট্যাণ্ডার্ড। এদেশে মোটরগাড়ি এত ছোট! রাস্তা ছোট, বাড়ি ছোট—নাঃ প্রায় অসভ্য দেশ।

অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তুলনা না করলে ভারতবর্ষও কম উন্নত দেশ নাকি!

এর পর আমাদের বাড়ি আর সবার ভালো লাগলেও একজনের খুব খারাপ লাগতে লাগলো—সে হ'ল কার্লো। রাণীদি এসেই আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও রান্নাঘর দখল করলেন। কার্লো নিজে রান্না করতে না পেরে কেমন যেন ক্ষেপে যেতে লাগলো। সামান্য কারণে চটতে লাগলো। একদিন একটা চেয়ার মেরামত করার নাম করে সেটাকে ভাঙলো। বিড় বিড় করে কি সমস্ত বকতে শুরু করলো। তারপর থেকে সে রেস খেলতে শুরু করলো। প্রতিদিন দু-তিন শিলিং এই বাবদ খরচ হ'তে লাগল তার। একজন লোককে রান্না করার



অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সে মানুষ খুন করতে পারে—রেস

খেলা তো সামান্য ব্যাপার। ইংল্যাণ্ডে রেস খেলা কেবল ব্যাপক ভাবে হয় বললে কমিয়ে বলা হয়। একটু ভাল ভাবে বর্ণনা দিতে গেলে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাবার কথা। রেসের জুয়ায় (এবং ফুটবলের জুয়ায়) বৃটেনে বহু কোটি টাকা প্রতি বছর খরচ হয়। রাণী এলিজাবেথের এই ব্যাপারে বেজায় উৎসাহ। দু-একটি কাগজ ছাড়া আর সমস্ত কাগজে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—রেস খেলার প্রেরণা দেওয়া হয়। রেস খেলবার নানা কোম্পানী আছে—তারা ডাকে, টেলিফোনে প্রতিদিন হাজার হাজার পাউণ্ডের কারবার করে। এটাও এক ধরনের রোগ। আর এ রোগ সারানোও যায় কিন্তু গভর্নমেণ্টের ক্ষতি হয়। ইংল্যাণ্ডে জুয়া খেলা বন্ধ করে দিলে গভর্নমেণ্ট চট করে বিষম বিপদে পড়ে যাবে। কারণ জুয়া খেলার ট্যাক্স তো আছেই, তা ছাড়া প্রতিদিন বহু লক্ষ চিঠি জুয়ার ব্যাপারে পোস্ট করা হয়—বহু হাজার টেলিফোন কল্ও করা হয়। এসব থেকে যা আয় হয় তার হিসেব দেখলে তাক লেগে যাবার কথা। রেস খেলা বৃটেনে অতি সাধারণ ব্যাপার—কোলকাতায় যাঁরা রেস খেলেন তাঁদের একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থান আছে। কতকগুলি লোক নিয়মিত রেস খেলেন, অধিকাংশই নির্বিকার। কিন্তু বৃটেনে প্রাপ্তবয়স্ক হলেই যেমন সিগারেটের দিকে নজর দেয়, বীয়ার খেতেও আরম্ভ করে (বীয়ার প্রস্তুতকারকেরা বলছেন বুড়োরা আজকাল মদ অনেক কম খাচ্ছেন—ছোটরা বেশি মাত্রায় খেয়েও সেটার ক্ষতি পূরণ করতে পারছে না), তেমনি তারা ঘোড়ার রেস খেলবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। এর ব্যাপকতা বোঝা যাবে আর একটা ব্যাপার থেকেও—কনসারভেটিব টাইমস খবরের কাগজ থেকে শুরু করে কমিউনিস্টদের ডেইলি ওয়ার্কার পর্যন্ত কোন ঘোড়া দৌড়বে, ঘোড়াদের বয়স, যোগ্যতা, উচ্চতা, ওজন, বংশ পরিচয় ইত্যাদি ছাপা হয়। ডেইলি ওয়ার্কার যদিও বেশি বিক্রি হয় না; কিন্তু যেটুকু হয় তার বেশ মোটা অংশই কেটন এর ঘোড়ার দৌড়ের ভবিষ্যদ্বাণী করার ফলে যে বিক্রি হয় সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই। ডেইলি ওয়ার্কারের কের্টন নাকি পর পর দু বছর ডার্বির দৌড়ে প্রথম হওয়া ঘোড়াটির নাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। ঘোড়া ছাড়া আছে কুকুরের দৌড়। জুয়ার দিক দিয়ে এও কম মারাত্মক নয়। মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন ঘোড়া এবং কুকুরের দৌড়ের বিজ্ঞাপন ছাপে না—ভবিষ্যদ্বাণীও করে না।

একবার আমার কিছু পরিচিত লোক কুকুরের দৌড়ে সর্বস্বান্ত হ'য়ে ওভারকোটগুলি বিক্রি করে রেসে হেরে গিয়ে আট মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলেন। ভারতীয়রাও যে ইংরেজের সঙ্গে রেসের নেশায় মাততে পারেন ওঁরা ছিলেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওঁরা প্রতি সপ্তাহে দু দিন কুকুরদের দৌড় দেখতে যেতেন—এবং কখনো জিততেন এবং কখনো হারতেন। নিশ্চয় হারতেন বেশি—কারণ এরকম বাজীতে জনসাধারণ হারবেই—সে জন্যই রেসের জুয়া চলে। জনসাধারণ জিতলে সঙ্গে সঙ্গে এ জুয়া দেশ থেকে উঠে যেত। কুকুররা দৌড়নোর হাত থেকে বেঁচে যেতো—ঘোড়ারা আস্তে আস্তে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত।

এই ঘোড়ার দৌড়ে আমরা একবার ভাগ্য ফেরাতে চেয়েছিলাম। টমি, আমি এবং মনোরঞ্জন বিশ্বাস। মনোরঞ্জন আর টমি দুজনে মিলে কাগজে কি লিখলো তারপর কাগজে চোখ বন্ধ করে আলপিন ফোটালো। তারপর চোখ খুলে দেখলো। অনেকক্ষণ সব চুপচাপ গম্ভীর আবহাওয়া। টমি অবশেষে বললো, পেয়েছি পেয়েছি। বিশ্বাস বুঝিয়ে বললো। বিভিন্ন খবরের কাগজে দেখা যাবে তাদের ওস্তাদের মতে বিভিন্ন ঘোড়া প্রথম হবে। একমাত্র নিশ্চিন্ত উপায় হচ্ছে আলপিন দিয়ে অন্ধভাবে ঘোড়ার তালিকায় খোঁচা দেওয়া। আলপিনের খোঁচা যে সমস্ত ঘোড়ার নামে পড়বে আমরা সেটাই ধরবো—কারণ এটাই সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়।

দুশিলিং দিয়ে পাঁচটা ঘোড়া থেকে আয় হওয়া উচিত—বিশ্বাস বললো, হাজারখানেক পাউণ্ড। অর্থাৎ তেরো হাজার টাকারও বেশি।

বিশ্বাসকে বললাম, আর যদি এই পাঁচটা ঘোড়া প্রথম না হয়। বিশ্বাস বললো, প্রথম না হয় দ্বিতীয় হবে, দ্বিতীয় না হয় তৃতীয় হবে। তা যদি হয় তাহলেও চল্লিশ পঞ্চাশ পাউণ্ড পাওয়া যাবে।

আমি বললাম, আর যদি চতুর্থ হয় ?

টমি বললো, অমন অলক্ষুণে কথা কইতে নেই। টমি দক্ষিণ ভারতীয় খৃষ্টান, এবং তার হিউমার বোধ অপরিসীম। মনোরঞ্জন পোস্টাল অর্ডার কিনে গ্লাসগোর উইলিয়াম হিল নামের বিখ্যাত জুয়া খেলার প্রতিষ্ঠানকে টাকা পাঠালো।

তারপর বিরাট এক নাটক !

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই মিষ্টার বোস বললেন কন্‌গ্রাচুলেশনস।

আমি চমকালাম। কী ব্যাপার। মিষ্টার বোস বললেন, টমি আর বিশ্বাস ফোন করেছিল—টমির বাড়িতে আসা মাত্র যেতে।

আমি বললাম, কেন ?

কার্লো বললো, তোমাদের ঘোড়ারা সব দৌড়েছে আর এক এক জনে ষাট পাউণ্ড পাবে !

ষাট পাউণ্ড ! বেশ আনন্দ হ'ল বৈকি। বেশ ভালই লাগল। সংবাদটা এতই ভাল যে আমার টাইটা কার্লোকে উপহার দিয়ে ফেললাম। হোর্ন ব্রাদার্সের দোকান থেকে 'সেলে' কিনেছিলাম—নগদ খরচ পড়েছিল ছ পেনি—সেটা কার্লোর খুব পছন্দ হয়েছিল।

বল্টু বললো, এবার ছুটিতে প্যারিসে যাও, ভাল জায়গা। রাত তখন প্রায় নটা। আমি আধ ঘণ্টার হাঁটা পথ, ট্যাক্সিতে গেলাম। গেলাম টমির বাড়িতে।

গ্লস্টার রোডের কাছেকার ড্রেটন গার্ডন্স। দেখি টমির ঘরে রীতিমতো পার্টি চলেছে। ওদের বাড়ির উপরের তলায় থাকতো এক রাশিয়ান মা, নাম তার ভেরা আর মেয়ে মাশা। ওরা দুজনে এসেছে। পাশের ঘর থেকে এসেছে ওয়াল্টার। এই জার্মান ছেলেটি কয়েকদিন হ'ল লণ্ডনে এসেছে বেড়াতে। বিশ্বাস এক কোণে

সোফায় বসে 'হোয়াটস অন' সাপ্তাহিক পত্রিকা ওলটাচ্ছে আর সুর ভাঁজছে। টমি ওয়াইনের গ্লাস সবাইকে এগিয়ে দিচ্ছে।

আমাকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা করল। ওয়াল্টার আমার হ্যাণ্ডশেক করে বলল, কনগ্র্যাচুলেশনস। আর ইউ দি হর্স ?

মাশা বললো, না ও ঘোড়া নয়।

ওয়াল্টার বললো, সে ইংরেজি জানে না অতএব এরকম ভুল যেন গ্রাহ্য করা না হয়।

ঐ ঘরে তৎক্ষণাৎ প্ল্যান করা হল ষাট পাউণ্ড খরচ করবার প্ল্যান। কোথাও যেতে হবে ছুটিতে।

কোথায় ?

সবাই যেখানে যায় সে জায়গা নয়। প্যারিসে তো সবাই যায়। ডেনমার্কে তো সবাই যায়, ইটালীতে তো সবাই যায়। কোনোটাই আমাদের পছন্দ হয় না।

অবশেষে টমি বললো, আমার বহুদিনকার ইচ্ছে আইসল্যাণ্ডে যাওয়া।

আইসল্যাণ্ড! নাম শুনেই আমরা স্থির করে ফেললাম আইসল্যাণ্ডই ভাল। মাশা বললো, আইসল্যাণ্ড খুব দূর হবে কি ?

টমি বললে, দূর! কতই বা দূর—বারো শ' মাইল। লণ্ডন থেকে অসলো বা ব্রিন্দিসিও ওড়া পথে বারো শ' মাইল। আমরা যাব জাহাজে। স্কটল্যাণ্ড থেকে সে জাহাজ ছাড়বে—ছোট জাহাজ, ছোট বন্দর। ঠাণ্ডা কিন্তু আমরা চামড়ার জামা নেব সঙ্গে।

অনেক রাত্রিতে বাড়ি পৌঁছলাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কেবল কার্লো ছাড়া। আমি বাড়িতে পৌঁছতেই কার্লো আমাকে বললো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি জেগে বসে রয়েছি বলব বলে।

আমি বললাম, কী কথা ?

কার্লো বললো, ষাট পাউণ্ড কম টাকা নয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ অনেক টাকা—প্রায় আটশো টাকা।

কার্লো বললে, এই টাকা দিয়ে অনেক কাজের জিনিস হয়।

বললাম, তা হয় বটে।

কার্লো বললো, সব টাকা পোস্ট অফিসে জমিয়ে রেখে দাও—একটি পয়সা খরচ ক'রো না।

কার্লোর কথাই শেষ পর্যন্ত রইল। একটি পয়সা খরচ করা হল না। আইসল্যাণ্ড যাওয়া বাতিল করা হল। কারণ টাকাটা পাওয়া গেল না।

আমাদের ফর্মে কিছু ভুল ছিল। কিন্তু সবাই তা জানত না। পরিচিত সবাই এটা জেনে গিয়েছিল যে আমরা ষাট পাউণ্ড পেয়েছি। লোকদের ভুল ভাঙানো এক সমস্যায় দাঁড়িয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। প্রতিটি লোককে বোঝাতে হয় যে আমরা টাকা পাইনি—সমস্ত ইতিহাস তো বটেই -তা ছাড়া ব্যাঙ্কের বই, পোস্ট অফিসের বই এ সমস্তই দেখাতে হয়। তবে যদি তারা বিশ্বাস করে।

মাসখানেক সময় গেল লোকদের বোঝাতে, তবে তারা বুঝলো। নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু একদিন হঠাৎ কার্লো আমাকে বললো, খরচ না করে খুব ভাল করেছ। তোমার মনের জোর আছে বলতে হয়। একটি পয়সা খরচ করনি—একটা শার্ট নয়, একজোড়া জুতো নয়··· না সত্যিই তোমার মনের জোর আছে।

কার্লো ধরে নিয়েছিল আমরা টাকাটা পেয়ে একেবারেই বদলে যাইনি।

রাণীদি আসবার পর আমাদের বাড়ীটির শ্রী ফিরলো। এই সময় লণ্ডনে ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হতেও লাগল। ব্রেনিম ক্রেসেণ্টের কাছে শ্রীমতী কণা বসুদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল এর আগে অরুণদের মারফত, তা ছাড়া প্রায় প্রথম থেকেই শ্রীমতী বেলা বসুর

সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। শ্রীমতী শেফালি নন্দীর সঙ্গেও দেখা হয়—ইনি বিলিতি অভিজ্ঞতা নিয়ে সুন্দর লিখেছেন। প্রথম প্রথম মনে হ'ত বোধ হয় লণ্ডনে ভারতীয় মেয়েদের সংখ্যা কম, কিন্তু মোটেই তা নয়। সবচেয়ে প্রথম আলাপ হয়েছিল যে ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে তিনি হলেন অনুদি – আমাদের নানুদার স্ত্রী। আর আলাপ হয়েছিল তরুণা বসু, তরলা গান্ধী, মঞ্জুলা রায়, জয়শ্রী চৌধুরী এবং প্রতিমা সিংহর সঙ্গে। আরো অনেক নাম বলা যায়। আজকাল যে শিক্ষিতা ভারতীয় মেয়েরা লণ্ডন পর্যন্ত যেতে সঙ্কোচবোধ করছেন না তার কারণ হল লণ্ডনে তাঁরা বেশ মানিয়ে নিতে পারেন। একটি বাঙালী শিক্ষিতা মেয়ে বালীগঞ্জ থেকে উত্তর কোলকাতার মদন মিত্র লেনে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে একা যেতে পারেন না—কিন্তু তাঁরা কোলকাতা থেকে লণ্ডনে সহজেই চলে যেতে পারেন। একজন বাঙালী মেয়ে কোলকাতা থেকে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও একা গিয়ে দু-তিন বছর থাকতে পারেন কি? অথচ ইউরোপে সহজেই থাকছেন।

ইউরোপ আমাদের কাছে একটা সহজ দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের নানা জিনিস আমরা বুঝতে না পারলেও সহ-অবস্থানের পক্ষে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না। আমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যতখানি কৌতূহলী তার চাইতে বেশি কৌতূহলী ইউরোপ সম্পর্কে। ইউরোপীয়রাও ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা এদেশে এসে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে ইতস্তত করেন। তাঁরা ভারতবর্ষকে কেমন চোখে দেখবেন তা যেন নির্ভর করে আমাদের উপর। তাঁরা যদি ভারতবর্ষে দারিদ্র্য দেখেন, অবৈজ্ঞানিক অনাচার দেখেন, আর তা যদি ঘুণাক্ষরেও লেখেন অমনি আমাদের পিত্তি জ্বলে ওঠে।

ইউরোপে ভারতীয় মেয়েদের কেমন লাগে তা ভারতীয় মেয়েদেরই লেখা উচিত। ভারতীয় মেয়েদের উল্লেখ করে বৃটেনের বিখ্যাত এক

সাপ্তাহিক কাগজে প্রায় দশ বছর আগে একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল, তার অংশ এখানে উদ্ধার করলাম :

> Lady, in your crimson sari, undulating
> up the queue
> For the fast eleven-thirty, Bournmouth—
> bound from Waterloo
> Do you like the way we travel ? Aren't our
> platforms cold and pale ?
> Don't you hanker for the chaos of the
> Old Calcutta Mail ?
> Do you never miss the voices crying
> coconuts and pan,
> Crying water for the Hindu, water for the
> Mussulman ;
> Miss the crowded wooden benches in the
> dilatory train,
> Miss the three-Days-journey distant village
> in the dusty plain,

ইত্যাদি। এর উত্তরও ভারতীয় মেয়েদেরই দেওয়া উচিত।

প্রথম থেকেই আমি বি. বি. সি. বা বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের প্রচারের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রথমে রেডিও শুনে এবং পরে বি বি সির বাংলা প্রোগ্রামে যোগ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে। বাংলা প্রোগ্রাম বি বি সি রেখেছে তাতে নিশ্চয় খুব সৎকাজ হয়েছে, কারণ বাঙালীরা এর ফলে কিছু কিছু টাকা পায়। আর যে কাজে বাঙালীরা কিছু পেয়ে যায় তা নিশ্চয়ই সৎকাজ। আমিও টাকার জন্য অন্যের লেখা সংবাদ পড়েছি। মোট দুবার। সে লেখা তৃতীয় শ্রেণীর, বক্তব্য আর কিছু নয়, চুটিয়ে বৃটিশদের প্রশংসা করা। তাও যদি লেখা ভাল হত বা অন্তত বুদ্ধিমানের মত লেখা হত। অবশ্য বৃটিশরা টাকা দিচ্ছে তাদের প্রশংসা করবার জন্য, কিন্তু তা বলে অমন জঘন্য লেখার জন্য নিশ্চয় নয়। আমি দুবার ঐ রকম অন্যের লেখা সংবাদ পড়ে দুবারই আপত্তি করলাম, বললাম লেখা অনেকখানি পালটাতে হবে। কিন্তু দুবারই বলা হল আমাকে যে তা সম্ভব নয়। এর পর আর বি বি সির দিকে পা বাড়াইনি। এই প্রসঙ্গে আমার অরুণ পালিতের কথা মনে পড়ে। অরুণ পালিতও বি বি সির ডাকে বাংলা প্রোগ্রামে যোগ দিতে গিয়েছিল। কন্‌ট্রাক্ট সই হয়ে গিয়েছে পাঁচ মিনিট সংবাদ পড়বে সে, এবং পাবে দেড় গিনী—একুশ টাকার কাছাকাছি। অরুণ লেখাটা একবার পড়লো—ঠিক বিশ্বাস হল না—দুবার পড়ল, না ঠিকই দেখেছে সে। যত রাজ্যের ভুল খবর দেওয়া মে-দিবস সম্পর্কে এক অনবদ্য অবদান। অরুণ বললো, অমন রচনা তার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়, অতএব মাথায় থাক দেড় গিনী, সে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। কেবল পা বাড়ালো তাই নয়, পা বাড়িয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের থেকে সাত নম্বর বাস ধরে ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে এসে গল্পটা বললো। সে খুব

উৎফুল্লভাবে বলেছিল কাহিনীটা। বলেছিল সেদিনই সে বি· বি· সি· কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখবে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর চিঠিটা লেখেনি। আমার যতদূর ধারণা বি· বি· সি·র বাংলা প্রচার তারপরও চলেছিল, এবং এখনও চলছে। বাংলাদেশে সে প্রচারের কোনো অর্থ হয় না—কজন লোকই বা অলওয়েভ সেট খুলে বসেন লণ্ডনের ঐ অপূর্ব সংবাদ শুনবার জন্য।

বি বি· সি·র ঐ বিদেশী ভাষায় প্রচার একটা বাজে খরচ বলে অনেকে মনে করেন। ওখান থেকে, সঠিক কটা ভাষা মনে নেই, তবে অন্তত ত্রিশটি ভাষায় বৃটিশ মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। অনুমতি না নিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসের কোনো কর্মচারী কোনো প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করলে তার চাকরি যায়। যাওয়াও উচিত।

কোনো কোনো লোক বলে থাকেন, বিদেশে ওভাবে প্রচার না করে ভাল ইংরিজি বই সে সমস্ত দেশে বিনা-মূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা করলে ফল আরো ভাল হয়। আমার মনে হয়, তার চাইতেও ভাল হয় নগদ টাকা দেওয়া। লোকে ধন্য ধন্য করবে, বি. বি. সি. থেকে সংবাদ প্রচারের কোন প্রয়োজনই হবে না।



বৃটেনে রেডিও প্রায় সমস্ত বাড়িতে। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এবং কখনো তার পরেও সার্ভিস চলে। প্রায় প্রথম থেকেই বি. বি. সি. প্রচারিত গান বাজনা বক্তৃতা নাটক ইত্যাদি শুনে শুনে কথা বুঝতে চেষ্টা করেছি। বৃটেনের এই ছোট্ট দেশেও যে কতরকম কথার ভঙ্গী তারও পরিচয় পেয়েছি প্রথমে ঐ রেডিও থেকেই।

আমাদের প্রথম প্রথম তাদের কথা বুঝতে সত্যিই খুব অসুবিধে হত। লণ্ডনের কক্‌নি, ওয়েলস-এর চাষী বা কেণ্টের জমিদারের ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আর স্কটল্যাণ্ড? তাহ'লে পুলকের কথা বলতে হয়। পুলক স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে আমাকে লিখলো সে

কাউকে কিছু বোঝাতে পারছে না, কারুর কথা সে বুঝছে না। ছবি এঁকে, অঙ্গভঙ্গী করে সে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। তারা বাসকে বলে বুস, ডাউনকে বলে ডুন, টাউনকে বলে টুন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কথা বলে মনে হয়েছিল যখন পুলক লিখেছিল, "আমার ল্যাণ্ডলেডি বি. বি. সি'র সংবাদ শোনেন না, কারণ এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারেন না।" ইংরিজি বুঝতে আরো বেশি সময় লাগে যাঁরা অন্য দেশে ইংরিজি শিখেছেন তাঁদের।

আমাদের এভনমোর রোডের বাড়ির যে ঘরে আমি স্থান পেলাম সেটি আসলে ছিল আমাদের পুরানো বন্ধু অমিতাভ দত্তের। অমিতাভ দত্ত ভারতবর্ষে চলে আসায় তার ঘরটায় আমি এসেছিলাম। এসে দেখি, তার ঘরে প্রচুর জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে—সেগুলো শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। লণ্ডনে যারা কয়েক বছরের জন্য বাসা বাঁধে, তাদের অনেক জিনিস না চাইতেই জুটে যায়। বিশেষ করে কেউ ভারতবর্ষে ফিরে যাবার সময় অনেক জিনিসই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, যেমন খাবারের প্লেট, কাপ, নানারকম ভাঙা সুটকেস—সেগুলোতে জিনিসপত্র রাখাই চলে, কিন্তু তা নিয়ে কোথাও যাওয়া চলে না। ইচ্ছে না থাকলেও লণ্ডনে, যতদিন যায় তত জিনিসপত্রের বোঝা জড়ো হ'তে থাকে। সেগুলো এমন জাতের জিনিস, যা না যায় ফেলা, না যায় রাখা। ঘরগুলো ছোট হওয়াতে রাখবার জায়গাও থাকে না। তা ছাড়া লঙ্কার গুঁড়ো, শুকনো পেঁয়াজ, টিনে করা মটরশুঁটি, টিনে করা মাংস এগুলোও জুটে যায়, না চাইতেই। কেউ ভারতবর্ষে ফিরে যাবে শুনলে অনেকেই কিছুদিন আগে থেকে তার বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করে—সব সময় যে বন্ধুত্বের খাতিরেই তা নয়—প্রায়ই দেখা যায় কাঁচের কুঁজো কিংবা কাপ প্লেটের জন্যও অনেকে যাতায়াত করছে। এ নিয়ে নানারকম মন কষাকষি চলে। কারুর হয়তো একটা কম্বল আছে—কম্বলটা ভাল। ল্যাণ্ডলেডি সব বাড়িতে কম্বল প্রচুর দেবেই তার কোনো মানে নেই। অনেক ল্যাণ্ডলেডি ভাড়াটেকে কম্বল

দেওয়াটা বিলাসিতার সমান মনে করে। বিশেষত ভাড়াটের রঙ যদি কালো হয় তাহ'লে তো তাকে কম্বল দেওয়া মানে টাকা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেওয়ার সমান। অতএব একখানা দুখানা কম্বল কাউকে কাউকে কিনতে হয়। এগুলো অবশ্য প্রায়ই যাবার সময় ফেলে যেতে হয়। অতএব এই কম্বল বা অন্যান্য ফেলে যাওয়া জিনিস সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়। কেউ কম্বল, কেউ গ্রামোফোনের রেকর্ড, কেউ বই, কেউ পেন্সিল এসব পাবার জন্য প্রায় ছেলেমানুষী শুরু করে। এগুলো যে তারা কিনতে পারে না তা নয়—কিনতে পারে, কিন্তু তারা প্রমাণ করতে চায় প্রত্যেকেই সবচেয়ে বড় বন্ধু, কারণ তাকেই ভাল জিনিস দিয়ে গেছে।

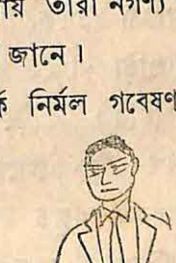
অমিতাভের ভারতবর্ষের যাওয়ার সময় এমনি কাণ্ড হয়েছিল। অনেক কিছু বিলি করেও অনেক কিছু রয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে খান কুড়ি রেকর্ড ছিল বাংলা এবং ইংরিজ। আর ছিল একটা বেহালা। ওর জন্য অবশ্য ভুল বোঝাবুঝিও অনেক হয়েছে। ঐ বেহালা ঘরে প্রকাশ্য জায়গায় রাখার ফলে বেশ কয়েকজন সামান্য পরিচিত লোকের সঙ্গে মন কষাকষি হয়ে গিয়েছিল। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন যে বেহালা যখন ঘরে আছে তখন নিশ্চয় আম তা বাজাতে পারি—পারি না বললে কেউ বিশ্বাস করে না। বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত আর বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাজালে আরো তাড়াতাড়ি পরিচিতেরা দূরে চলে যায়। কখনো আমার সঙ্গে দেখা করতে আর আসে না।

লণ্ডনে আসবার আগে আমরা শুনেছিলাম ওখানে আমাদের সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা বিয়ে করেছে গোপনে। যদিও ঠিক বুঝতাম না যে যদি তারা গোপনেই বিয়ে করে থাকে তাহলে খবরটা দেশে পৌঁছুলো কেমন করে? আমরা বন্ধু-বান্ধবদের দেখলাম তারা একাই রয়েছে। তাদের বললাম, চালাকি নয়, বৌ কোথায় বার করো। তারা তো অবাক। আমরা ধরে নিলাম যে তারা বিয়ে ব্যাপারটাকে ভয়ানক গোপন

রেখেছে। আর আশ্চর্যও হলাম, কারণ বিয়ে করে গোপনে রাখা সেটা তাদের একটা বেজায় কেরামতি। বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে সেটা সম্ভব হয় না। আশ্চর্য হলাম এই ভেবেও যে আমাদের বন্ধুদের প্রত্যেকেই বিয়ে করেছে আর তাদের প্রত্যেকেই ব্যাপারটা লণ্ডনে গোপনে রেখেছে কেমন করে? তাদের বাড়িতে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত সময়ে উপস্থিত হয়েছি কিন্তু দেখেছি বন্ধুরা কেউ শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনছে, নইলে সসেজ ভাজছে, নয়তো চান করছে অথবা ঘুমুচ্ছে। তাদের বৌদের দেখা পাইনি। ব্যাপারটা তাতে আরো সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। আমরা সপ্তাহ দুয়েক খুঁজেই একটা সত্য আবিষ্কার করেছিলাম সেটা হল এইঃ বন্ধুরা বিয়ে করেনি। কিন্তু যা জানতে আমাদের সপ্তাহখানেক লেগেছিল তা বার করতে অনেকের পক্ষেই বহু বছর সময় লাগে। ওখানে বিয়ে করাটা খুব অ-সাধারণ অবশ্য নয়। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক ওস্তাদ নির্মল রায় লণ্ডনে বহুদিন ধরে গবেষণা করছে কেন ভারতীয় ছেলেরা বিদেশে লেখাপড়ায় ফেল করে। ও একদিন বলেছিল যে ভারতীয় ছেলেদের শতকরা ষোলভাগ বিয়ে করবার সম্ভাবনা। যারা দু বছরের কম থাকে তাদের বিয়ে করবার সম্ভাবনা শতকরা পাঁচেরও কম।

গোপনেও কেউ বিয়ে করে থাকে। কিন্তু সংখ্যায় তারা নগণ্য। আর সেগুলো নামেই গোপন—আসলে সকলেই সেটা জানে।

ইঁদুর এবং ভারতীয় ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নির্মল গবেষণা



করছিল। তবে ও ফেল করবার সংবাদ পেলেই উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, কারণ তাতে ওর একটা করে কেস বাড়ে। তার হাতে থাকে এক বিরাট প্রশ্নপত্র, সেই প্রশ্নপত্র নিয়ে ছাত্রদের কাছে যায়। ও স্বভাবতই যায় ফেলকরা ছাত্রদের কাছে। কেন তারা ফেল করেছে তা খুঁটিয়ে বার করে, ফেলকরা ছাত্ররা এতে খুব খুশী হয় না। অথচ নির্মলের এই কাজ। লণ্ডনের যে সমস্ত ছাত্রেরা

নির্মল সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে তাদের সবাই অন্তত একবার যে ফেল করেছে সে বিষয়ে প্রায় বাজী রাখা চলে। ফেল করার অনেকগুলি কারণের মধ্যে নির্মল দেখিয়েছে যে একা একটা ঘর নিয়ে থাকলেও লোকে ফেল করে, দুজনে মিলে থাকলেও ফেল করে, ল্যাণ্ডলেডির বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকলেও ফেল করে। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে ফেল করবার জন্যে কোন বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয় না। তবে ভারতীয় ছাত্রদের চাইতে যে ইংরেজরা বেশি ভাল করে সব সময় তাও নয়। আবার যারা নিজে আয় করে পড়াশুনা করে তারাও যে বেশি ফেল করে তা নয়। বাড়ি থেকে টাকা এনে পড়েও অনেকে ফেল করে।

ছাত্রেরা পরীক্ষা দিলে পাস এবং ফেল দুই রকমই হয়। ইংল্যাণ্ডেও হয়, ভারতবর্ষেও হয়।

লণ্ডনে প্রচুর কাঁচ। এত কাঁচের ব্যবহার দেখে আমাদের চোখে একটু আশ্চর্যই লাগে। আশ্চর্য লাগার কারণ, এত বড় বড় কাঁচ অথচ কেউ ঢিল ছুঁড়ে ভাঙে না। কোলকাতায় এরকম কাঁচের ব্যবহার হলে আমরা নিশ্চয় সেগুলোকে আস্ত রাখতাম না। দেশে আলো কম, ঠাণ্ডা বলে কাঁচের বিরাট জানালাই তো প্রশস্ত। তাতে আলো ঢোকে, কিন্তু বাতাস ঢোকে না। রোদ্দুর ঘরে ঢোকে, কিন্তু ঠাণ্ডাটা বাইরে আটকে যায়। দোকানের শো কেসে বিরাট কাঁচের ব্যবহার। বাড়িতে, বিশেষ করে আধুনিক বাড়িগুলিতে কাঁচের ব্যবহার বেশ বেড়ে চলেছে। ইংল্যাণ্ডেও যে আধুনিক বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেটা কিরকম অদ্ভুত শোনায়। তবে সুখের কথা আধুনিক বাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই।

আমাদের পাড়াটা একটু পুরানো ধরনের। এই পাড়া থেকে কয়েক মিনিট হাঁটা পথ শেফার্ডস বুশ অঞ্চল। সেখানে ঘুরে ঘুরে একদিন পুরানো বাড়িগুলি দেখলাম।

এই পাড়াতেই বাস করতেন মাইকেল মধুসূদন। রাস্তার নাম উড

লেন। নম্বর চোদ্দ। এখানে মাইকেল ঠাণ্ডা জলে চান করতেন ভয়ানক শীতের মধ্যেও। তখন মধুসূদনকে বছরে একবার বাড়িভাড়া দিতে হত। বাড়িওলা এবং ভাড়াটের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। লণ্ডনে খুব কম বাড়ি ছিল, বাড়িভাড়াও ছিল প্রচুর। মধুসূদন শখ করে ঠাণ্ডা জলে চান করতেন না। তিনি একটি চিঠিতে চান করা সম্পর্কে লিখেছেন : It is a fearful trial to one's nerves ! এখনো বাড়িওলার সঙ্গে যে গোলযোগ হয় না তা নয়। তবে কালো লোকদের সঙ্গে ল্যাণ্ডলেডির গোলযোগ একটু বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে।

এভনমোর রেডের ফ্ল্যাট থেকে চলে যাবার কথা হল কারণ মিস্টার বোসের আর এইরকম জীবন ভাল লাগছিল না। আমাদেরও ভাল লাগছিল না বিশেষ করে কার্লোর তো একেবারেই নয়। সে ছু-একবার বলেওছিল যে হয় সমস্ত রান্নায় নারকেল দিতে হবে নয়তো সে বাড়ি ছেড়ে দেবে। স্থির হল আমি এবং আমার পিসিমা এবং পিসতুতো ভাই (কয়েকদিন আগে এসেছে) একটা ফ্ল্যাট নেব আর রাণীদিরা আলাদা একটি ফ্ল্যাট নেবেন। কার্লোকেও বলা হল নিজের জন্য আস্তানা খুঁজে নিতে।

বাড়ি খুঁজতে বেরুতাম মাঝে মাঝে। ঐ পাড়ায়, আর্লস কোর্টে, ব্যারন্স কোর্টে। কোথাও বাড়ি মিলত না। অনেক ল্যাণ্ডলেডি বলতো ফোনে, বাড়ি আছে। কিন্তু সেখানে গেলে তারা আমাদের গায়ের রঙ দেখে বলতো, ভাড়া হয়ে গিয়েছে। দুঃখিত।

এটা যে সবটাই বর্ণবিদ্বেষ তা নয়। ভারতীয় বা নিগ্রোরা অনেকেই বাড়িকে ব্যবহার করে না—করে অপব্যবহার।

আমাদের অধিকাংশই ঘরের মধ্যে পেঁয়াজ এবং শুকনো লঙ্কা ভাজি, সে গন্ধে অনেকেই টিকতে পারে না। তা ছাড়া ইংরেজ কেন, ভারতীয় বাড়িওয়ালাও অনেক আছেন যারা ভারতীয়দের বাড়িতে রাখতে চান না।

বাড়ি না পেয়ে অবশেষে একদিন শরণাপন্ন হলাম বেলাদির। বেলাদি বললেন হ্যাম্পস্টেডে তাঁদের ফ্লাটটাই আমরা নিতে পারি। ফ্ল্যাটটার সঙ্গে লাগানো এক বিঘের বেশি বাগান, বারান্দা, দুখানি ঘর, রান্নাঘর, টেলিফোন ইত্যাদি। ভাড়া সপ্তাহে চার গিনি। রাস্তার নাম লিণ্ডফিল্ড গার্ডনস। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম যে ঐ বাড়িটিই আমরা নেব, কারণ বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হচ্ছিলাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমরা যে সমস্ত বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই তার কোনোটাই প্রায় আমাদের পছন্দ হয় না, ভাড়া বেশি মনে হয়—আর যদি ভাড়া ঠিক মনে হয় তো বাড়িওয়ালা আমাদের পছন্দ করে না। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি একদিন আর্লস কোর্টের ডগলাস ওয়েস্ট নামের এক বাড়ির দালালদের অফিসে এসে হাজির হলাম। তাদের বাড়ি খুঁজবার জন্য টাকা দিতে হয় অগ্রিম। তিন গিনি—বা প্রায় চল্লিশ টাকা। জমা দেবার আগে পর্যন্ত তারা অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছিল—খুব ভদ্রতা করেছিল। কিন্তু টাকা পাবার পরই চটপট কথাবার্তা সেরে একজন মহিলা কর্মচারী বললেন: প্রতি সপ্তাহে তোমাকে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন পাঠাব, যদি বিজ্ঞাপন দেখে কোনো ফ্ল্যাট পছন্দ হয় তবেই তার ঠিকানা দেবো। ঠিকানা কাগজে ছাপানো পাবে না। তবে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা কবতে হবে বলে মনে হয়।

তিন চারদিন অপেক্ষা করতেই একখানা চিঠি এসে হাজির। তাতে বারো চোদ্দটা বিজ্ঞাপন। কোনোটিই সাপ্তাহিক ছ সাত পাউণ্ড-এর কম নয়। দু একটিতে লেখা আছে ভারতীয়দের নেওয়া হবে না। কোনটিতে শিশু বা কুকুর থাকলে ভাড়া দেওয়া হবে না। আর একটি দুটিতে লেখা আছে ভাড়া ছ পাউণ্ড কিন্তু গায়ের রঙ কালো হলে সাত পাউণ্ড! প্রথম সপ্তাহে কোথাও যাওয়া হল না। দ্বিতীয় সপ্তাহে দু একটি ফ্ল্যাট চার পাঁচ পাউণ্ডের মধ্যে বিজ্ঞাপনে দেখে ডগলাস ওয়েস্টের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করতে গেলাম যখন,

তখন তাঁরা বললেন, এগুলি দেখে কোন লাভ নেই কারণ, ফ্ল্যাটগুলি ভাড়া হয়ে গিয়েছে।

ঐ বাড়ির এজেণ্টের দরজায় দিব্যি ভিড় দেখতে পেতাম। বিশেষ করে রঙ যাদের কালো। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি খুব আন্তরিক ভাবে কাজ করতো বলে আমার মনে হয়নি। কারণ, আমরা বহুদিন অপেক্ষা করেও তাদের কাছ থেকে কোনো রকম সত্যিকারের সাহায্য পাইনি। পরে লোকেদের কাছে শুনেছি লণ্ডনে বাড়ির দালালরা সবাই খুব সৎ নয়। দু একটি কেস পড়েছি খবরের কাগজে, এই ভাবে প্রচুর টাকা অনেক কোম্পানী জনসাধারণের কাছ থেকে মেরে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তো আইন করতে বাধ্য হল যে বাড়ি খুঁজে না দিতে পারলে দালালের টাকা মিলবে না। এখন অবস্থার উন্নতি হয়েছে, দালালেরা সত্যিই বাড়ি খুঁজছে। আর বাড়ির সমস্যাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রতি বছর প্রচুর বাড়ি তৈরি হচ্ছে ওখানে।

লণ্ডনের অধিবাসীদের মধ্যে উদ্ভিজ্জ অধিবাসী আছে প্রচুর। আমি গাছপালার কথা বলছি। বসন্তে এবং গ্রীষ্মে লণ্ডন সবুজ হয়ে ওঠে। এত বেশি গাছ কোনো শহরে আছে বলে আমার মনে হয় না। গাছগুলির সৌন্দর্যও অসাধারণ। ওক, এলম, অ্যাশ, স্কটস-পাইন, বীচ, বার্চ লাইম, পপলার, হলি বা ইউ গাছ এ সমস্তই লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। পপলারের ছায়া ঠাণ্ডা, সেই ছায়ায় বসলে সমস্ত প্রকৃতিকে ভাল লেগে যায়। আর আছে উইপিং উইলো বা কাঁদুনে উইলো। এ গাছ জলের ধারে হয় বেশির ভাগ আর ডাল নুয়ে পড়ে জলের উপর। মনে হয় যেন কেঁদে কেঁদে গাছ পুকুর করে ফেলেছে। গাছের সৌন্দর্য ইংল্যাণ্ডে যেমন করে বোঝা যায় আর কোনো দেশে তেমন করে বোঝা যায় কি না



জানি না। জগদীশচন্দ্র বসুর পদার্থ বিদ্যা থেকে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করতে যাওয়ার মূলেও হয়তো এই বিলিতি গাছদের সৌন্দর্য।

এভনমোর রোডে আমার জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যেত হর্স চেস্টনাটের গাছ। হর্স চেস্টনাটের পাতাগুলি কাঁঠাল পাতার চেয়েও বড় আর ওর গোছা গোছা ফুল দূর থেকে মনে হয় যেন জ্বলন্ত মশাল। ফুলের রঙ সাদা। এই গাছ জানালার এত কাছে ছিল যে মাঝে মাঝে এটা থেকে ফুল ছিঁড়ে নিতে অসুবিধা হত না। এখানে মৌমাছির সংখ্যাও সামান্য নয়। এখানে অবশ্য মৌমাছির চাষ করা হয়। বুনো মৌমাছিও প্রচুর। এক সের মধুর দাম যৎসামান্য, দু টাকার কিছু বেশি। দোকানে দোকানে টিনে বা বড় মুখওয়ালা বোতলে মধু পাওয়া যায় কিনতে। সেগুলো রুটির সঙ্গে খেতে বেশ লাগে।

এভনমোর রোডের পাড়ায় পোর্টোবেলা রোডের মত হাট নেই। কিছু দূরে হ্যামারস্মিথ, সেখানে শনিবারে হাট বসে রাস্তায়। কিন্তু দশ মিনিটের হাঁটা পথ সেখানে গিয়ে আমরা কখনো হাট করিনি। পাশে কিছু দোকান ছিল, আর ছিল লায়ন্স স্টোর্স। লায়ন্সের খাবার দোকানে যেমন খাওয়াও যায়, তেমনি তাদের দোকান থেকে শুকনো চা, কফি, কেক, রুটি এ সমস্ত কেনা যায়। তাদের যে মাংস, মাছ, চাল ডালের দোকান ছিল তা জানতাম না। একমাত্র এভনমোর রোডের পাড়াতেই দেখেছি। এদের দোকানটিতে মনে হয় দাম একটু বেশি নিত, জিনিস সমস্তই খুব ভাল পাওয়া যেত। সবই বাছা বাছা জিনিস। দোকানে টিনের অংশও কম নয়। টিনের মধ্যে মাংস, মাছ, সসেজ, রান্না করা মাংস, কাঁচা আপেলের টুকরো, চিনির সঙ্গে কমলালেবু মেশানো, ঘন দুধ, অলিভ তেল কত রকমের যে জিনিস পাওয়া যায় তার সীমা সংখ্যা নেই। বাজার না করে কেবল টিনের খাবার খেয়েও অনেক দিন কাটানো যায়। অনেক সময় কাঁচা ফলের চাইতে টিনে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রাখা ফল বেশি সুস্বাদু হয়। আম পর্যন্ত আমরা টিনে ভর্তি কিনেছি। ভারতীয় নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সেগুলোর

চালান আসে। রাণীদি এসে রান্না করা শুরু করলে কার্লো চটে গিয়ে বাড়ি খুঁজতে শুরু করলো নিজের জন্য, আর বাড়ির রান্না না খেয়ে প্রচুর টিনের খাবার খেতে শুরু করলো। অধিকাংশই মাংস—আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে চালান আসে সেগুলো। এক টিন মাংসের দাম দুশিলিং, দুবেলা একজনের চলে যায়।

কার্লোর স্বপাক খাওয়া দেখে মনে হ'ল ওকে একটু জব্দ করা যাক। ও চার পাঁচটা টিন কিনে রাখতো, মাংসের, আনারসের ইত্যাদি। আমি এবং বল্টু ঠিক ঐ রকম আকারের অন্য জিনিসের টিন আনলাম—তার কোনটায় রয়েছে দুধ, কোনটায় আম। সেগুলো এনে লেবেলগুলি জলে ভিজিয়ে তুলে বদলে দিলাম। ওর টিনগুলি ঠিক রইল, কিন্তু লেবেলগুলি গেল বদলে।



কার্লো একদিন শনিবারে দেরি করে এসেছে। আমাদের তখন খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে। কার্লো এসে প্রথমে মার্গারিন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে হলুদ নুন লঙ্কা এবং নারকেল দিয়ে বেশ মেশাচ্ছে। তারপর সে মাংসের টিন নিয়ে এসে খুলতে আরম্ভ করলো টিন খোলা যন্ত্র দিয়ে। টিন খুলে সে হতভম্ব। তার মধ্যে আম। সে লেবেলটা পড়লো—তাতে লেখা আছে মাংস—অথচ ভেতরে আম।

গজগজ করতে লাগল। আমরা বললাম, ব্যাপারটা কি ? কার্লো বললো কালে কালে কতই না দেখব। মাংসের টিনে আম! আমরা বললাম কই দেখি! বলে প্লেটে সবাই আম নিয়ে খেয়ে শেষ করে দিলাম। কার্লো তখন আর একটা টিন নিয়েছে তাতেও লেখা আছে মাংস, এবারে সে টিন থেকে বার হ'ল মধু! এর পর সে পর পর পাঁচটা টিন খুলে ফেললো, আর একটা আনারসের টিন থেকে বেরুলো ষ্ট্রবেরী!

ক্ষেপে গিয়ে সে সমস্ত টিন দোকানে দিয়ে এল ফেরত।

দোকানদারকে আগেই শেখানো ছিল। দোকানদার তাকে ফেরত দিয়ে দিল। নতুন একটা মাংসের টিন নিয়ে সে বাড়িতে এসে যখন খুললো, তখন···পাওয়া গেল কৌটো ভর্তি জ্যাম!

কার্লো এবারে রেগে নাচতে আরম্ভ করলো। এত বেশি সে কখনো রাগেনি বা নাচেনি এর আগে। সে নাচতে নাচতে বলতে লাগলো, ইংরেজরা বদমাশ! তাদের জাতের আর উন্নতির আশা নেই!

আমরা ওর জন্য রান্না করেই রেখেছিলাম—ওকে তাই খেতে দিলাম। কিন্তু ওর গজগজানি আর কিছুতেই থামে না। পরে তাকে যখন বোঝালাম এটা আমরাই করেছি তখন সে স্থির করলো আবার সে চেয়ার মেরামত করবে। কিছুতেই তাকে চেয়ার মেরামত করা থেকে নিবৃত্ত করা গেল না।

অর্থাৎ বাড়িতে আর একটি চেয়ার কম পড়ল। কার্লো যদি এমনি মেরামত করতে থাকতো তাহ'লে শীগগিরই সে বাড়িতে চেয়ার আর থাকত না। কিন্তু সব সমেত ও দুটো চেয়ারই মেরামত করেছিল। ল্যাণ্ডলেডি খুঁতখুঁত করেছিলেন, কিন্তু টাকা আদায় করেননি।

কার্লোর বাড়ি সিংহল। কাজ করত ইণ্ডিয়া হাউসে। ভারতীয় এই অফিসে ভারতীয় কজন মাইনে পান জানি না, তবে শ' তিন চার যে ভারতীয় নন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইণ্ডিয়া হাউসে মরিশাসের লোক, আফ্রিকান, ইংরেজ সবাই কাজ পায়। একবার একটি জার্মান মেয়েকেও কাজ করতে দেখেছি। এমনকি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট—মিলিটারি এবং এয়ার ফোর্সের বাড়িতেও অভারতীয় লোককে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেখেছি। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে আমার। কারণ লণ্ডনে আমাদের অফিস থেকে কি কি কেনা বেচা হয় তার হিসেব যে কোনো অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে জানার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

লণ্ডনে যত দিন গেল তত দেখলাম চোখের সামনে সমস্ত জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের পাড়ার

কাফেতে, লায়ন্সের দোকানে, বাসে, টিউবে সর্বত্র এক পেনি আধ পেনি করে দাম বাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম, গ্যাসের দাম বেড়ে চলতেই লাগল। এই দামের গতি খুব কম সময়েই কমতির দিকে দেখেছি। এমনকি বৃটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস ছিল একেবারেই দাতব্য। যে কোনো অপারেশন এবং যে কোনো ওষুধ যে কোনো লোকই বিনামূল্যে পেতে পারত—এমনকি চশমার পর্যন্ত দাম দিতে হ'ত না। কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলোর জন্য কম হ'লেও মূল্য দিতে হ'ল। কিন্তু যেমন হয়ে থাকে, সস্তার তিন অবস্থা—সে চশমার ফ্রেম ছ মাসের বেশি টিকলে লোকেরা "সেলিব্রেট" করে। দোকানে ঢুকে বন্ধু-বান্ধব পাড়ার লোকেদের বীয়ার খাইয়ে দেয়।

আগে প্রেসক্রিপশনে ওষুধ পাওয়া যেত বিনা মূল্যে। তার পর স্থির হ'ল, প্রতি প্রেসক্রিপশনে এক শিলিং দিতে হবে। এখন প্রতি ওষুধের জন্য এক শিলিং দিতে হয়। একেও নামমাত্র মূল্যই বলা চলে, কারণ একশো টাকা দামের ওষুধও বারো আনায় পাওয়া যায়। একথায় আমাদের অবাক হবারই কথা।

ইংরেজেরা চোরা-কারবার করে—ওষুধেও চোরা-কারবার করে, গাঁজা, ভাঙ, আফিঙও তারা গোপনে বিক্রি করে। তবে ইংরেজরা সুযোগ পেলেও সবাই চোর হয় না। অধিকাংশ লোক সৎ প্রকৃতির হওয়ার জন্যই এ রকম নিয়ম চালু রাখতে পারে তারা। তা ছাড়া পুলিস অপরাধীদের বার করবার জন্য সব সময় চেষ্টা করে বলে অপরাধীরা প্রায়ই ধরা পড়ে। সবাই যে



টাকার অভাবেই চুরি করে তা নয়। আমাদের দেশেও বহু ব্যবসায়ীর টাকার অভাব নেই, কিন্তু তারা ভেজাল দিয়ে লোক খুন করছে রোজ—টাকার জন্য। এটা এক রকমের অভ্যেস। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজরা চোর নয়। ইংরেজরা সব জিনিস চুরি করে না। যেমন খবরের কাগজ এবং দুধ। দোকানদার সমস্ত খবরের কাগজ রাস্তায়

ফেলে রেখে চলে যায়—লোকেরা সেখানে পয়সা রেখে কাগজ নিয়ে আসে। বাড়ির বাইরে থাকে দুধের বোতল, চুরি করার পক্ষে এর চাইতে সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই। অথচ এগুলি কিছুতেই চুরি হয় না।

—একেবারেই কি দুধের বোতল চুরি হয় না?

—হয়তো দু একটি হয়। কিন্তু বোতল চুরি না হলেও দুধ চুরি হয়।

—সে আবার কি রকম কথা? চুরি তো হয়।

—হ্যাঁ হয়। কিন্তু এর জন্য মানুষ দায়ী নয়।

—তবে কে?

—তবে বলি। এর জন্য দায়ী হল পাখি। ও পাখির নাম হল ব্লু-টিট। এর চেহারা ছোট, গায়ের রঙ প্রধানত নীল কিন্তু পিঠের উপরে খানিক সবুজ, পেটের কাছে হলুদ রঙ এবং মাথার উপর সামান্য লাল। এই পাখিগুলি দুর্দান্ত। এরা মানুষের বাড়িতে বাসা নেবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। গোল্ড ফিঞ্চ পাখি যেমন খুঁজে বেড়ায় বাস-গর্ত, এরা তেমনি খুঁজে বেড়ায় মানুষের বাড়ি। আর এরা দুধ খায়।

আগে বোতলে থাকতো কাগজের ঢাকনা। কাগজ খুলে দুধ খেতে এই ব্লু-টিটের ছিল সুবিধে, এখন ধাতুর ঢাকনা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ব্লু-টিট এ ঢাকনাও খুলতে শিখেছে। লণ্ডনের বেশ কিছু দুধ ব্লু-টিটে চুরি করে খায়।

দুধ সস্তা এ দেশে। এক পাইণ্টের দাম সাত পেনি। মাখনের সের দু টাকারও কম। দুধ সবাই খায় বলে মনে হয়। হয় দুধ নয়তো চা বা কফী—মোট কথা প্রচুর দুধের ব্যবহার। অথচ লণ্ডনে গরু নেই। কোলকাতার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক লণ্ডনে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন লণ্ডনের দুধ কলে তৈরি হয়, কারণ সমস্ত লণ্ডনে গরু নেই! গরু না থাকলে তার দুধ আসে কোত্থেকে?

আসে লণ্ডনের বাইরে থেকে। বাইরে গরুদের যত্নে রাখা হয়।

কিন্তু মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে বোঝানো দায়। তিনি কিছুতেই বুঝবেন না যে গরুর খাটি দুধ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পেতে হ'লে তাদের লণ্ডনের বাইরে রাখাই ভাল। সেখানে প্রচুর ঘাস আছে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দুঃখিত হয়েছিলেন খুব। তিনি বলেছিলেন, গরুর দুধের জন্য নয়, গরু যে দেবতার সমান—অন্তত সেজন্যও কিছু কিছু গরু লণ্ডনে রাখা উচিত।

এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সম্পর্কে আরো দুটো গল্প আছে। ইণ্ডিয়া হাউসে রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তি আছে—সেটিকে দেখে তিনি তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন, হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের নাম তাঁর জানা আছে খুব বড় কবি—কবিতা লিখে এত খাতির পেয়েছিলেন যে তাঁকে ভারতবর্ষের প্রথম হাইকমিশনার করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত তিনি উনসত্তর গিনি খরচ করে একটা টেলিভিশন সেট কিনেছিলেন। কেবল কেনা নয়—কোলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি কোলকাতার লোকদের অবাক করে দিতে চেয়েছিলেন।

কোলকাতার লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করি না।

আমরা যখন জাহাজে আসি তখন বহু লোক বলে দিয়েছিল যে লণ্ডনে চুল কাটার ব্যাপারে সাবধান থাকতে। নাপিতেরা নাকি মাথায় কাঁঠাল ভাঙে। আমি আর পুলক বসু এক জাহাজে এসেছিলাম, আমরা লণ্ডনে চুল কাটাবার ভয়ে জাহাজে চুল কাটিয়ে নিয়েছিলাম।

কিন্তু লণ্ডনে গিয়ে দেখলাম সেখানেও চুল কাটার প্রয়োজন।

চুলকাটা খবরের কাগজের মত অনেকটা। খবরের কাগজের সঙ্গে চুল কাটার সম্পর্ক আমাদের দেশে আছে। এতে গায়ে চুলও পড়ে আর খবরের কাগজটিও নষ্ট হয়। তা ছাড়া একবার যেমন এক বছরের মত খবরের কাগজ কিনে রাখা যায় না, তেমনি একবারে এক বছরের মত চুলও কাটিয়ে রাখা যায় না।

লণ্ডনে চুল কাটাতে যেতেই হল। দেখলাম খুব যে শক্ত ব্যাপার

তা নয়। চুল কাটাতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে, দু শিলিং দাম লাগে আর ছ পেনি বকশিশ দিতে হয়। কিন্তু একে হেয়ার কাট বলে না, বলে ট্রিম। লণ্ডনে সবাই ট্রিম করে। যারা হেয়ার কাট করায় তাদের খরচ হয় প্রচুর। দু তিন পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ হতে পারে। অতএব আমরা একটি মাত্র মন্ত্র জপ করতাম আর তা হল, কেবল ট্রিম করে দাও।

সব সময় চুল কাটাবার পর বোঝা যেত না চুল কাটা হয়েছে কিনা। আমরা প্রায়ই চুল কাটিয়ে এসে বন্ধুবান্ধবদের বলতাম যে চুল কাটিয়ে এসেছি। না বলে দিলে কেউই প্রায় বিশ্বাস করত না।



এইখানে একটি ঘটনা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। সাধন ঘটকের ফ্ল্যাটে প্রতি শুক্রবার রাত্রে কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলা হত। আসলে সেখানে ঝগড়াই বেশি হত। সেখানে অবতার সিং মারওহা, সুনীত রায়, অনিল আইচ, গডবোলে, নটরাজ শর্মা, সুনীল চ্যাটার্জি ইত্যাদি সবাই খেলতে যেত, আমিও যেতাম। খারাপ খেললে ঘটক বলত, ব্রিজ খেলতে আস কেন, লুডো খেললেই পারো? এই খেলাটার একটি ব্যাপার আমার মাথায় এখনো ঢোকে না—তা হল নিজে ছাড়া আর সবাই কেন ভুল খেলে? যাই হোক, এই খেলায় কিঞ্চিৎ বাজি রাখা হত। প্রতি পয়েন্টে এক পেনি। একবার সারারাত্রি খেলে অনিল আইচ দশ শিলিং জিতেছিল। অনিল খেলা শেষ করে দেখলো শুক্রবারটা কেমন করে শনিবার হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে।

দশটার সময় তার একজন ইংরেজের সঙ্গে দেখা করার কথা পিকাডিলিতে।

হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটে বেরুলো।

পিকাডিলিতে এসে দেখলো বেলা তখন সাড়ে ন'টা, ইরসের মূর্তি, লাল লাল বাস, ব্যস্ততা চারদিকে।

আর লোক। চারিদিকে লোকজন।

সারারাত্রি তার ঘুম হয়নি। অন্যমনস্ক ভাবে সে তার গালে হাত দিতেই চমকে উঠলো।

দেখা করতে হবে ইংরেজের সঙ্গে। কিন্তু দাড়ি!

ঢুকে পড়লো চুলকাটার দোকানে। চেয়ারে বসলো।

দাড়ি কামিয়ে দাও—বললো নাপিতকে। বলে সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল।

নাপিত ঐ অবস্থাতেই দাড়ি কামালো। তার মুখ ম্যাসাজ করে দিল, চুল টেনে টেনে দিল। মাথায় তেল মালিশ করে দিল। আধ ঘণ্টা লাগল প্রায়।

অলরাইট সার!

ঘুম ভাঙল অনিলের। হ্যাঁ অলরাইট তো বটেই। কিন্তু দশটা বাজে। এই নাও পয়সা—বলে দশ শিলিঙের নোটটা দিল নাপিতের হাতে। নাপিত নোট নিয়ে দেখলো। একটু হেসে বললো, আপনার ভুল হ'য়েছে। অনিল বললো, ও খুচরো নেই বুঝি? কী বিপদ!

নাপিত বললো; খুচরো দোকানে যথেষ্টই আছে তবে দশ শিলিং চার্জ নয়—চার্জ সাড়ে বারো শিলিঙ। আরো আড়াই শিলিঙ চাই। নাপিত বিল দেখালো:

দাড়ি কামানো	—দেড় শিলিং
ম্যাসাজ	—দশ শিলিং
তেল	—এক শিলিং
মোট	সাড়ে বারো শিলিং

অনিলের ঘুম ভেঙে গেল। সে এক শিলিং বকশিশ সমেত সাড়ে তেরো শিলিং নাপিতকে দিয়ে বেরুলো। এখনো অনিলের দাড়ি কামাতে গিয়ে প্রতিবারই সে কথা মনে পড়ে।

আর একটি ছেলে, নাম তার প্যাটেল। মে-ফেয়ারের ফ্যাশন দুরস্ত এক চুলকাটার দোকানে সে ভুল করেই ঢুকে পড়ে একদিন। যখন সে বেরোয় তখন তার পকেট থেকে তিন পাউণ্ড কমে গিয়েছে।

চুল কাটতে তার লেগেছিল তিন পাউণ্ড। দোকানদার তাকে কি ভেবেছিল কে জানে। হয়তো ভেবেছিল ভারতীয় মহারাজাই হবে। তাকে খাতির করেছিল মহারাজারই মত।

তার সাপ্তাহিক মাইনে ছিল তিন পাউণ্ড পনের শিলিং ন পেনি। ছ পেনির এদিক ওদিক হ'লে তার সমস্ত বাজেট গোলমাল হ'য়ে যায়। সে বাড়িতে খায় দুধ রুটি আর ভেজিটেবল, কখনো দু একটা সস্তা হেরিং মাছ। কখনো সে সিনেমায় যায় না। কোনো বন্ধুর সঙ্গে সে প্যারিস বা রোম কেন, লণ্ডনের আশে পাশের উইণ্ডসর বা সেণ্ট অলবানসে সে যায় নি। যাওয়ার মত তার অবস্থা ছিল না। সে ভাবতেই পারত না লণ্ডন থেকে বাইরে কেউ যেতে পারে। অফিস, বাড়ি এবং পড়াশুনা এই ছিল তার জীবন।

সেদিনই তাকে দিতে হবে ঘরভাড়া, দেড় পাউণ্ড। থাকে হ্যাম্পস্টেডের ভারতীয় বাড়িওয়ালা বেনারসীর প্রায়ভাঙা বাড়িতে।

লাঞ্চের পর যখন চুল কেটে অফিসে ফিরে এল তখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখছে। কী করবে সে। কোথায় যাবে, কেমন করে সপ্তাহ চালাবে? অথচ দোকানদার যখন জিজ্ঞেস করেছিল, চুলটা কি রাজা ষষ্ঠ জর্জের মত করে কেটে দেব? সে আপত্তি করেনি। সে দাম জিজ্ঞেস করেনি।

চরম দুরবস্থায় ভারতীয়রা যা করে সে তাই করলো। হাসপাতালে গেল। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের বাড়িভাড়া বাকী পড়ে গেলে তারা হাসপাতালে যায়। তাদের পক্ষে এটা আশীর্বাদ—কারণ এর ফলে থাকা খাওয়ার খরচ বেঁচে যায়। জিনিস-পত্রগুলো বন্ধুর বাড়িতে রেখে দেয়।

কেউ তাই লণ্ডনে হাসপাতালে গেলে চলতি কথাই ছিল : ও কি ছুটিতে কন্টিনেণ্টে যাচ্ছে। সে জন্যই কি টাকা জমাচ্ছে ?

না কি প্রচুর ধার হ'য়েছে ?

এই তুটি কারণ ছাড়া কেউ হাসপাতালে যাবেই বা কেন ? হাসপাতালে যাওয়ার আরো কতকগুলি কারণ আছে—সেখানে কেবল বাড়িভাড়া খাওয়ার খরচই যে বাঁচে তা নয়—সেখানে সর্বদা ঘর গরম—গ্যাসের খরচ নেই। অত ভাল খাওয়া সাধারণ হোটেলে পাওয়া যায় না। ওখানে পড়াশুনা করবার মত প্রচুর সময় পাওয়া যায়। সিনেমা দেখানো হয়—বিনামূল্যে। পাওয়া যায় নার্সের যত্ন। ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে যা পাওয়া অসম্ভব। "অসুস্থ" থাকলে মাইনে বেশী পাওয়া যায়। ন্যাশনাল ইনশিওর‍্যান্স থেকে টাকা পাওয়া যায়। আর একটা সুবিধে আছে যদি কোন অসুখ থাকেই, সেটাও সারানো যায় হাসপাতালে।

এত সুবিধে অতএব হাসপাতালে যাবে না কেন ?

প্যাটেলও তাই করেছিল। প্রয়োজন কেবল একটি ডাক্তারের সার্টিফিকেট। লণ্ডনে চেনা ডাক্তার সার্টিফিকেট দিতে কার্পণ্য করে না। এ রকম সার্টিফিকেট দিতে ডাক্তারের একটি পয়সাও খরচ হয় না।

এবারে লিণ্ডফিল্ড গার্ডনস্।

বেলাদি বাড়ি বদল করলেন, ঐ রাস্তারই পাশের বাড়িতে গেলেন। আমরা চলে এলাম পশ্চিম থেকে উত্তর লণ্ডনে। এবারে বাড়িটি হ'ল বড় একটি ফ্ল্যাটের অংশ।

পাড়ার নাম হ্যাম্পস্টেড।

পাহাড়ী অঞ্চল—প্রচুর গাছপালা চারদিকে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পাওয়া যায়, সবচেয়ে বেশি স্নো পড়ে, কুয়াসা সবচেয়ে কম হয়।

এ পাড়া নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। একশো বছর আগে এ

দিকটায় লোক-বসতি প্রায় ছিল না। লোক-বসতি ছিল না তার কারণ এখনো কলের জলের ব্যবস্থা হয়নি। এক বালতি জলের দাম তখন এ পাড়াতে ছিল এক শিলিং। ডাকাতেরা ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকত—পথিকদের আক্রমণ করত। এর জঙ্গল থেকে চোর-ডাকাতদের খুঁজে বার করা বেজায় কঠিন কাজ ছিল।

এই পাড়ায় চোর-ডাকাত ছিল আর ছিলেন এক কনেস্টবল। এই কনস্টেবলটি কখনো একটি চোরও ধরেননি। না খেয়ে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি জীবনে একটি চোর না ধরলেও ইনি অন্য অনেক কিছুই ধরেছেন, বন্দী করেছেন। ইনি গাছপালা, দৃশ্য, গরু-ঘোড়া এ সমস্ত তাঁর তুলি এবং ক্যানভাসের সাহায্যে ধরে রেখেছেন। তার প্রমাণ এখনও আছে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি এবং স্টেট আর্ট গ্যালারিতে।

এঁর নাম জন কনস্টেবল। বেঁচে থাকার সময়ে তাঁর ভাগ্যে সম্মান এবং টাকা জোটেনি। এখন তাঁর ছবির দাম হাজার হাজার পাউণ্ড। শিল্পীরা মরে না গেলে যে তাঁদের সম্মান হয় না ইনি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এখনও অনেক শিল্পী হ্যাম্পস্টেডে থাকেন; তাঁদেরও অনেকের ধারণা মরে গেলে তাঁরাও বিখ্যাত হবেন। তাঁদের ছবি দেখে অনেক সমালোচক বলেছেন তাঁদের মরাই উচিত। হ্যাম্পস্টেডে শিল্পীরা বেড়েই চলেছে। প্রতি পাঁচজন হ্যাম্পস্টেডের লোকের মধ্যে একজন হ'লেন শিল্পী। সংখ্যাটা আমার অনুমান।

এই অবস্থা সমস্ত দেশে হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ত। সুখের কথা, ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র শিল্পীদের এমন প্রাদুর্ভাব নেই। হ্যাম্পস্টেডের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শিল্পীদের আধিপত্য। এই শিল্পীরা ছেঁড়া পোশাক পরেন (একজন শিল্পীবন্ধু বলেছেন এঁরা নতুন পোশাক থাকলে ছিঁড়ে নেন) দাবা খেলেন, কফী খান, জাঁ পল সার্তর এবং ডিলান টমাস সম্পর্কে আলোচনা করেন, এভরিম্যান সিনেমা হলে ত্রিশ বছরের পুরানো ভাল ছবি দেখে প্রবন্ধ লেখেন (তা ছাপা হয় না),

বন্ধুদের পড়ে শোনান, বন্ধুরা প্রতিটি কথা ভুল প্রমাণ করেন—প্রতিটি মতই অগ্রাহ্য বলে মন্তব্য করেন। এই রকম বাধা পেলে তাঁরা আরো উৎসাহিত হন, আরো সমালোচনা লেখেন। কিন্তু একবার প্রশংসা করলে এঁদের সবাই সমালোচককে অনার্য লোক বলে গালমন্দ করেন। এঁদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই ন্যায় বিচার হয় না। এঁদের কেউ যদি বিখ্যাত না হন তাহলে সেটা হল সমাজের অন্যায় বিচারের ফল, আর যদি কেউ বিখ্যাত হন তাহলেও সেটা যে অন্যায় বিচারের ফলেই হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় এঁদের নেই।

এঁরা সমস্ত প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী। গ্রুচো মার্কসের মত whatever it is, we are against it মন্ত্রে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা নেগেটিভধর্মী। এক কথায়, এঁরা ইনটেলেকচুয়াল। সমস্ত হ্যাম্পস্টেড ইনটেলেকচুয়ালে ভর্তি। কিন্তু আমাদের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হেইসের মধ্যে আধ আউন্সও ইনটেলেকচুয়াল হবার ক্ষমতা ছিল না। ইনি টাকা বুঝতেন, এবং টাকা তাঁর ছিল। টাকা ছাড়া আর অন্য কোন রকম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকা পছন্দ করতেন না।

মিসেস হেইসের বয়স ছিল প্রায় যাট। জাতে ইহুদী। এঁর ছেলে ইহুদী নাম হেইস পছন্দ করত না বলে নাম বদলে করেছিল হলফোর্ড। হলফোর্ড ছিল ডাক্তার। হলফোর্ড এ বাড়িতে থাকতো না—কিন্তু তার প্রচুর বই ছিল। বাড়ির দুটি বড় তাক ভর্তি বইগুলিতে ছিল রুচির পরিচয়। পিকাসো এবং মনড্রেয়ান, রেনোয়া এবং স্যূরা প্রভৃতি শিল্পীদের সম্পর্কে বড় বড় বই। তা ছাড়া বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে নানা ধরনের বই।

এই ফ্ল্যাটটি ছিল বেসমেণ্টে। একতলা এবং দোতলায় অন্যরা থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। লণ্ডনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই রীতি। আমদের দেশের

ঠিক উল্টো। আমাদের দেশে প্রতিবেশীরা সমস্ত রকম ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য—যেমন, আপনার বেতন কত, স্ত্রীর বয়স কত, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার থাকতে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করান কেন, আপনি কাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলেন, রবিবার সকালে যে ভদ্রলোক ডাকতে এসেছিলেন আপনাকে তাঁর নাম কি, ঠিকানা কি, তিনি কত মাইনে পান ইত্যাদি এ সমস্তেরই জবাব দিতে হয়। লণ্ডনে এ সমস্তের জবাব দিতে হয় না। কেউ বিপদে পড়লে কিন্তু লণ্ডনের প্রতিবেশীরা সজ্জন হয়ে ওঠে।



লণ্ডনে একটা ব্যাপার খুব লক্ষণীয় হ'য়ে উঠছে। একবার যে বাড়িতে ভারতীয়রা যায় সে বাড়িতে আস্তে আস্তে ভারতীয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমে এমন হয় যে, শেষ পর্যন্ত সে বাড়িটার সমস্তই ভারতীয় লোকজনে ভরে যায়। এটা কেমন করে হয় বলছি। একটি বাড়িতে দশখানা ঘর, প্রায়ই লোকেরা উঠে যায়—উঠে যাবার আগে বাড়ির লোকেরা জানতে পারে ঘর খালি হবে। ভারতীয়টি যদি জানতে পারে যে একটি ঘর খালি হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার ভারতীয় বন্ধুকে বলবে একটি ঘর খালি আছে—সে ল্যাণ্ডলেডিকেও বলবে যে, তার বন্ধু খুবই ভদ্র, সে আসতে চায় এই বাড়িতে। ল্যাণ্ডলেডির কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়—কারণ সে যখন একজন ভারতীয়কে ঘর ভাড়া দিয়েছে, অন্য একজনকে ভাড়া দিতে আপত্তি কি? এই এই ভাবে আস্তে আস্তে এক একটা বাড়ি ভারতীয়রা অধিকার করতে আরম্ভ করে। যে বাড়িতে প্রচুর ভারতীয় সে বাড়িতে ইউরোপীয়ান বা অ্যামেরিকান কেউই থাকতে চায় না। কারণ প্রতি ঘর থেকে পেঁয়াজ লঙ্কা রসুনের গন্ধ সমস্ত বাড়িটিকে ভ'রে তোলে। বিশেষ ধরনের ফুলপ্রুফ নাক না হ'লে সে গন্ধ সহ্য করা কঠিন। এইরকম বাড়িতে ভারতীয়রা থাকে। প্রত্যেকের আলাদা ঘর হ'লেও তারা নিজেদের

মধ্যে নানা রকম মামা কাকা ভাই দাদা খুড়ো সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়। খুব বন্ধুত্ব হ'য়ে যায় পরস্পরের মধ্যে।

খুব যেমন বন্ধুত্ব হয়, তেমনি শত্রুতাও হয়। প্রথমে গলায় গলায়, পরে আদায়-কাঁচকলায়। একত্র থাকতে থাকতে নানা রকম আর্থিক আদান প্রদান চলে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ধার করার চেষ্টা করে। এই সব বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা ভারতীয়দেরই কেবল পরিচয় পান। অনেকে লণ্ডনে বছরের পর বছর থাকেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একটি অভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। তাঁদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় ইংরেজদের কেমন লাগল? তাঁরা উত্তর দেন: ইংরেজ তো কোলকাতার অফিসের সায়েব, সেই তো ইংরেজ। লণ্ডনে ইংরেজ টিংরেজ দেখিনি—তবে হ্যাঁ, বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবীতে লণ্ডন ভরা।

লণ্ডন ভরা—কথাটা ঠিক নয়। তবে রেলওয়েতে বা কাউন্টি কাউন্সিলে আজকাল প্রচুর ভারতীয় কেরানিগিরি করে। প্রচুর লোক লণ্ডন ট্র্যানসপোর্টের কাজ করে। শুনেছি প্যাডিংটন স্টেশনের একজন বাঙালী ইনফরমেশন কাউন্টারে বসেন—বাঙালীরা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, দাদু, বলতে পারেন অক্সফোর্ডের টিকিট কোত্থেকে কিনব?

বাঙালী দাদু দু পাটি দাঁত দিয়ে নিজের জিভটাকে কামড়ে ধরেন, তারপর বলেন, ঐ তো ঐ দিকে পথ লেখা আছে—আর আমাকে বাঙলায় কথা কওয়ান কেন মশাই? ইংরেজদের খাচ্ছি ওদের ভাষায় কথা না কইলে চাকরি যাবে!

কিন্তু চাকরি গেলেই বা কি, ন্যাশনাল-ইনশিওর‍্যান্স আছে না? চাকরি গেলেই যেমন আমাদের দেশের অনেকে রাস্তায় বসে পড়েন, সারাদিন ভিক্ষে করেন, ইংল্যাণ্ডে চাকরি গেলেই কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় বসবার জো নেই। প্রথমত গবর্নমেণ্ট থেকে তাকে কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়—তাতে ভিক্ষে করতে হয় না। এটা তার প্রাপ্য—এটা হ'ল ইনশিওর‍্যান্স। কিন্তু এতেও যদি না চলে, তাহ'লে আছে

ন্যাশনাল অ্যাসিসট্যান্স, এরাও প্রচুর সাহায্য করে থাকে লোকদের। দ্বিতীয়ত রাস্তা জায়গাটা বসবার পক্ষে খুব সুবিধেজনক নয়। বড় ঠাণ্ডা!

ভারতীয়দের বাড়ি দখল সম্পর্কে আমার জানা একটি ঘটনার কথা বলছি। সে বাড়তে জন-কুড়ি ভারতীয় থাকত—অন্য কোন জাতের লোক ছিল না। কি কারণে একটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে ল্যাণ্ডেলেডির গোলযোগ হওয়ায় ল্যাণ্ডলেডি ছাত্রটিকে চলে যেতে বলেন বাড়ি থেকে। ব্যাপারটা অন্য ভারতীয়রা শুনে ল্যাণ্ডলেডিকে অনুরোধ করলো যে নোটিস প্রত্যাহার করা হোক। ল্যাণ্ডলেডি কর্ণপাত না করাতে কুড়ি জন ভারতীয় এক সঙ্গে নোটিস দিল ল্যাণ্ডলেডিকে।

বাড়ি বদলের দিন সে এক আশ্চর্য ঘটনা। প্রায় একশো জন ভারতীয় জমা হয়েছে বাড়ির সামনে। প্রত্যেক ভারতীয় তাদের চার-পাঁচজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাড়ি বদলানোতে সাহায্য করবার জন্য। প্রচুর ট্যাক্সি জমায়েত হয়েছে বাড়ির সামনে। হৈ চৈ করে জিনিসপত্র নামানো হয়েছে! চারিদিকে প্রতিবেশীরা মজা দেখছে। দু-একজন পুলিসও জুটে গিয়েছে কী হয় দেখবার জন্য। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত বাড়িটাতে নেমে এসেছিল কবরের গাম্ভীর্য। একটি ভাড়াটে নেই, কেবল ল্যাণ্ডলেডি।



কোনও কোনও ল্যাণ্ডলেডি ভাল যে হন না তা নয়। তাঁরা ভাল, কিন্তু ভারতীয়দের অভ্যাসের কথা তাঁরা জানেন না বলে রাগ করেন। ইংরেজদের গতিবিধি প্রায় মাপা। তাঁদের গতিবিধির যেটুকু বৈচিত্র্য আছে তাতেই তাঁরা খুশী। ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁরা পাল্লা দিতে পারেন না। বিশেষত ল্যাণ্ডলেডিরা একটু বেশি মাত্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে কাতর হয়ে পড়েন। ইংরেজদের ধারণা যে মানুষের বেশি বন্ধু থাকার প্রয়োজন নেই—এক আধজন যদি থাকে ভাল, না থাকলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু ভারতীয়দের বন্ধু প্রচুর—আর বন্ধুদের কাজ হ'ল বাড়িতে আসা, এসে হৈ চৈ করে গল্প করা এবং এগারোটা বারোটায় লোকে ঘুমিয়ে পড়লে বিনা কারণেই ফোনের ঘণ্টা বাজিয়ে জাগানো। কোন কোন ল্যাণ্ডলেডি সামান্য আওয়াজও সহ্য করতে পারেন না। রেডিও যদি জোরে বাজানো হয় তাহ'লে তাঁরা সেটাকে অপরাধ মনে করেন। অথচ খুব জোরে রেডিও না বাজালে আমরা রেডিও রাখবার অর্থই খুঁজে পাই না। একটা আইন এদেশেও আছে যে রেডিও এত জোরে খুলে রাখা চলবে না, যাতে প্রতিবেশীদের অসুবিধে মোটেই না হয়। আমাদের দেশে যেমন প্রতি শহরে চার পাঁচটা রেডিও থাকলেই চলে যায়, ইংল্যাণ্ডে তা চলে না। সেখানে এমনকি পাশের ঘরের রেডিও শোনা যায় না এমন আস্তে বাজানো হয়।

আমাদের নতুন বাড়িটি ভালই হ'ল। তবে ফার্নিচার প্রায় কিছু-মাত্র ছিল না। সমস্তই ভাঙা এবং কোনক্রমে ব্যবহার করা চলে। একটা টেবিলের পা এমন নড়বড়ে ছিল যে সে টেবিলের উপর কিছু রাখা চলত না। অন্তত সে টেবিলে খাওয়া কিছুতেই চলত না। হঠাৎ ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। সে কথা বলাতে মিসেস হেইস বলতেন টেবিল ওমনিই হয়। আস্ত টেবিল লণ্ডনের কোন ল্যাণ্ডলেডিই দেয় না।

ল্যাণ্ডলেডিকে বললে কোন অভিযোগের প্রতিকার হয় না যে তার প্রমাণ বহুবার পেয়েছি। নিজেদেরই সারিয়ে নিতে হয় পয়সা খরচ করে। আমাদের এবারে ইলেকট্রিক হীটার ব্যবহার করতে হল—কারণ গ্যাস হীটার নেই এ বাড়িতে। একটা ঘরে কয়লা দিয়ে ঘর গরম করতে হয়। কয়লা পাওয়া কঠিন। একটি কয়লাওয়ালার কাছে নাম লেখাতে হল। তারা কয়লা দিয়ে গেল গাদা খানেক। সে কয়লা সমস্তই ভিজে। আমি আর রন্টু (পিসতুতো ভাই বয়স ৯ বছর) দুজনে মিলে মাঝে মাঝে লোহার শিক দিয়ে কয়লা ভাঙতাম বাগানে। বৃষ্টি পড়লে সেখানে ছাতা নিয়ে যেতে হত। সেখানে বসে

আস্ত কয়লাকে টুকরো টুকরো করতে হত। এর ফলে অর্ধেক কয়লা গুঁড়ো হ'য়ে ছিটকে বাগানের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হত। বাকী যা থাকত এক বালতি বোঝাই করে এনে জ্বালবার ব্যবস্থা করতে হ'ত। এজন্য শুকনো কাঠ বাড়িতে মজুদ রাখতে হত। এই শুকনো কাঠের টুকরো প্যাকেটে করে দোকান থেকে কিনে আনতাম। একটা ছোট প্যাকেট কিনতে পাঁচ ছ পেনি খরচ পড়ত। এই কাঠ কিন্তু সহজে জ্বলত না। এই কাঠ জ্বালানোর জন্য আবার প্রয়োজন হ'ত খবরের কাগজ।



কিন্তু সব সময়ে খবরের কাগজে কাজ হ'ত না। কেরোসিন ব্যবহারও করে দেখেছি। তা ছাড়া আর একরকম জ্বালানি বাজারে পাওয়া যেত, খয়েরের মত দেখতে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি পোড়ে আর বেশ তাপও হয়। প্যাকেটে ছটা ঐরকম খয়ের থাকে, দাম ছ পেনি। প্যাকেটে লেখা থাকে যে প্রতিবার আগুন ধরাতে একটি কিংবা দুটি খরচ করলেই হয়। কিন্তু দেখা গেল অধিকাংশ সময়েই হয় না।

কম পক্ষে চারটে করে খয়ের পোড়াতে হয়।

কয়লা ধরাতে সময় লাগে অন্তত এক ঘণ্টা। কয়লা যখন ধরে আসে তখন বড় ভাল লাগে। কিন্তু তখন কয়লার আগুন উপভোগের সময় নেই।

হাত ধুতে হবে। সারা হাতে কয়লার দাগ, মুখে কয়লার দাগ। চান করলেই ভাল হয়। রোজই প্রায় চান করতে হ'ত।

এরকম আগুনের কোন অর্থ বুঝি না। কারণ কয়লা জ্বালিয়ে বেশ আরাম করছি হয়তো—এমন সময় টেলিফোন এল পুলক চক্রবর্তীর। ওর কাছে যেতে হবে বেলসাইজ স্কয়ারে। সেখানে কী এক পার্টি হ'চ্ছে কনটিনেণ্টাল ক্লাবে। অত কষ্টে তৈরি করা আগুনকে ফেলে যেতে হয়, নিবিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না।

এরকম বাড়িতে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'চ্ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া। লেপ গায়ে দিয়ে।

যে ইলেকট্রিক হীটার ছিল এ বাড়িতে তার উত্তাপ এত কম যে হীটারের ইঞ্চি তিনেক দূরে হাত না রাখলে একটুও গরম লাগত না।

পুলক চক্রবর্তী যেখানে থাকত সে বাড়িতে থাকতো সাধারণত ইউরোপের ছেলে-মেয়েরা। পুলক যে ঘরে প্রথমে গিয়েছিল সে ঘরে আরো ত্বজন লোক থাকতো।

তারা জার্মান বা ইটালিয়ান নয়।

তারা ইউরোপের লোক নয়। তাদের আবাস চীন দেশে। তাদের সঙ্গে পুলকের হ'ল বন্ধুত্ব।

ঐ চীনে ছেলে ত্বটি রোজই তাদের গেঞ্জি শার্ট ইত্যাদি সাবান দিয়ে কাচতো, শুকুতো এবং ইস্তিরি করতো।

লণ্ডনে ধোবার খরচ প্রচুর। একটা শার্ট ধুতে দেড় শিলিং পর্যন্ত লাগে। আমাদের এক টাকার সমান। অতএব নিজে ধুয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভাল। এর জন্য ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যায়। কোন কোন দোকানে প্রচুর ওয়াশিং মেশিন রাখা হয়—সেখানে গিয়ে আধ ঘণ্টায় পাঁচ ছ সের ওজনের জামা-কাপড় আড়াই শিলিং খরচ করে ধুয়ে আনা যায়। তারপর শুকিয়ে ইস্তিরি করে নিলেই হয়। অনেকেই এটা করে থাকে।

চীনেরাও তা করতো।

একদিন পুলক চীনে ছেলে ত্বটিকে বললো, ভাই, তোমরা আশ্চর্য কাণ্ড করছ—এমন স্থন্দর ধোয়া আর ইস্তিরি এত দেশ ঘুরলাম কিন্তু কোথাও দেখিনি। আর বোধ হয় এজন্মে কোথাও দেখব না।

চীনে ছেলে ত্বটি বিনয়ের অবতার। তারা বলে, এ তো খুব সোজা—সবাই করতে পারে, এমনকি তুমিও করতে পার। পুলক আরও বিনয়ের সঙ্গে বলে, না আমি কিছুই পারব না—আমার দ্বারা জামা কাপড় ধোওয়া হবে না। চীনেরা ভরসা দেয়—হবে হবে। একদিন

তারা পুলকের পুরনো জামা ইত্যাদি ধুয়ে নিয়ে এল ওয়াশিং মেশিনে। পুলক দেখলো।

চীনেরা বললো, এবারে ইস্তিরি করা শিখে নাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ কেমন করে আমরা করি। পুলক তাও দেখলো।

তারপর দিন থেকে রোজ চীনেরা পুলকের সমস্ত জামা কাপড় ধুয়ে দেয়। ইস্তিরি করতে শেখায়।



কিন্তু পুলক কিছুতেই শিখতে পারে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ে অথবা দাড়ি কামায় আর মাঝে মাঝে ইস্তিরি করা দেখে। পুলক ইস্তিরি করা কিছুতেই শিখতে পারেনি। প্রায় তিন মাস চীনারা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেয়। তার পর তারা বাড়ি ছেড়ে দেয়।

লণ্ডনের ধোপারা কাপড় কাচতে বড় দেরি করে।

এদের দোকান আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশি নয়। সাত দিনের কমে সুতির কাপড়-জামা পাওয়া যায় না। কখনো পনের দিনও লেগে যায়। এই ধোপা দোকানদারেরা খুব গম্ভীর মুখ করে থাকে। কোথাও তাদের হাসতে দেখিনি। ইংল্যাণ্ডে সমস্ত দোকানেই দোকান-কর্মচারীদের হাসবার নিয়ম—এমনকি মাংসের দোকানদার পর্যন্ত হেসে জিজ্ঞেস করবে, এ দেশ ভাল লাগছে? আমাদের দেশের আবহাওয়া নিশ্চয় তোমাদের ভাল লাগে না?

কিন্তু ধোপাদের হাসতে দেখিনি। এরা হাসে না, কিন্তু এদের রসিকতাবোধ আছে। এরা অন্যের শার্ট, অন্যের রুমাল—বিশেষ ক'রে অন্যের তোয়ালে প্যাকেটে ভরে দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার রক্ষার আইন-কানুনে ইংল্যাণ্ডের বাতাস ভারী, কিন্তু জামা-কাপড়ের বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শার্ট পরে—পরতে বাধ্য হয়।

শার্ট নতুন কিনেছ, নাকি ধোপা দিয়েছে? এই কথাটি আমাদের মধ্যে খুব পরিচিত ছিল। কেউ নতুন শার্ট কিনলে তাকে জব্দ করবার জন্য খুব সহানুভূতির সঙ্গে বলা হ'ত, ভাই, তোমার ধোপা বড়ই অসৎ তো!

ঐ যে শার্টটি পরে আছ, ওটা তো তোমার নয়, তোমার ও রকম রুচিই হবে না—ব্রাউন রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট তোমাকে মোটেই মানায় না।

কেন?

মানায় না—বটে?

একদম মানায় না।

তুমি জেনে রাখো, এই শার্ট আমি নিজের পয়সায় এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিনেছি।

মাপ করো ভাই। আমি জানতাম না।

একবার খুব মজা হয়েছিল। সাধনের প্যাকেটের সঙ্গে অন্য কোন এক ভদ্রলোকের প্যাকেট সুদ্ধ বদলে গিয়েছিল।

তিন দিন সে রেগে ছিল। ব্রিজ খেলেনি, বন্ধুদের খাওয়ায়নি—এমনকি রান্না করেনি পর্যন্ত। তারপর সে একটা কাঁচি দিয়ে সমস্ত জামা কেটে ফেলে দেয়। কারণ, ঘটকের গলার মাপ ষোল ইঞ্চি, আর ধোবার দেওয়া শার্টগুলির প্রত্যেকটি চৌদ্দ ইঞ্চি।

ধোবার দোকানে বলেও কোন ফল হয়নি। তারা বলেছিল, নম্বরে মিলে যাচ্ছে অতএব এ নিশ্চয়ই সাধনের জামা। সাধন বলেছিল, না এ জামা আমার নয়, যে কোন গাধাই সেটা বুঝতে পারবে।

কিন্তু দোকানদার বুঝতে পারেনি।

সে জামা কিনল এবারে—নাম তার টেরেলাইন। এ জামা ধোবাকে দিতে হয় না। বাড়িতে বেসিনে পাঁচ মিনিটে কাচা যায়, দু ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে যায়।

এই জামার ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তুলোর প্রাধান্য কমছে। এর পর বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকনা সবই এ দিয়ে তৈরি হবে হয়তো।

লোকে যত এই নতুন জিনিসের জামা ব্যবহার করছে তত ধোবারা কম টাকা পাচ্ছে—আর ততই ধোয়ার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এর পর হয়তো একটা জামা ধোয়ার খরচ দিয়ে একটা জামা কেনা সম্ভব হবে। লোকেরা বাড়িতে যত কাপড় ধুচ্ছে ততই সাবানের বিক্রি বাড়ছে।

বিশেষ করে গুঁড়ো সাবানের।

আর প্রচুর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে সাবানের গুঁড়োর। সব সাবানের গুঁড়োতেই সমান কাজ হয়—সমান পরিষ্কার হয়। একটু কম বেশি হ'লেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু সাবান কম্পানিরা বিজ্ঞাপন দেয়, আমাদের সাবান দিয়ে ধুলে সাদার চেয়েও সাদা হয়। অন্য একটি কম্পানি বিজ্ঞাপন দেয় কেবল সাদাতে আর চলবে না, এর সঙ্গে প্রয়োজন উজ্জ্বলতার। অন্য একটি কম্পানি বিজ্ঞাপন দেয়, ঔজ্জ্বল্য আরো স্থায়ী করে আমাদের সাবানের ফেনায়।

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় একটা জিনিস—ইংরেজরা বেশি সাবান ব্যবহার করছে—অতএব তারা পরিষ্কার জাত। কথাটা সত্যি। আর একটা জিনিস মনে হয় যে ইংরেজরা সাবানের জন্য যত খরচ করছে তার চাইতে বেশি খরচ করছে বিজ্ঞাপনের জন্য।

অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ করছে কম্পানিরা কোটি কোটি টাকা। এই টাকা দিচ্ছে ক্রেতারাই। অর্থাৎ ক্রেতারা একটা জিনিসের জন্য দাম বেশি দিচ্ছে। অথচ কোন জিনিস বিক্রি করতে হ'লে বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে সাবান বিক্রির ব্যাপারে তারা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

বাসে, টিউবে বিজ্ঞাপন, রেডিওতে টেলিভিশনে সর্বত্র বিজ্ঞাপন। অধিকাংশই সাবানের।

সাবানের গুঁড়োর দাম মাঝে কমিয়ে দেওয়া হয়। যার দাম দু শিলিং প্যাকেট, তার দাম একটি কোম্পানি হঠাৎ এক শিলিং দু পেনি করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কম্পানি তাদের সাবানের দামও কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দেখা গেছে তাতেও তাদের লাভই থাকে।

লিণ্ডফিল্ড গার্ডনসে বেলাদি হ'লেন আমাদের প্রতিবেশী। এক দিন দেখি বেলাদি দু-একটা জিনিস কেমিস্টের দোকান থেকে কিনেছেন। তার মধ্যে একটা টিউব—সানট্যান লোশনের।

ইউরোপে এই জাতীয় লোশনের বিক্রি খুব বেশি। যাঁরা রৌদ্রস্নান করেন, বাগানে বা সমুদ্রের ধারে তাঁদের গা যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য আগে থেকে এই তৈলাক্ত পদার্থটি মেখে নিতে হয়। কিন্তু ভারতীয়দের এ জিনিস বিশেষ প্রয়োজন হয় না—কারণ ভারতীয়রা ইংরেজদের মতো অত সূর্যের আলোয় চান করবার পক্ষপাতী নয়। তাই ওটা দেখে অবাক হলাম। বললাম, বেলাদি, রৌদ্রস্নান করেন নাকি আপনি?

—কৈ না! কে বললে?

—আপনার কাছে সানট্যান লোশন দেখছি কি না তাই! ঐটে গায়ে মেখে সায়েব-মেমেরা সমুদ্রের ধারে মড়ার মত পড়ে থাকে।

বেলাদি বললেন, এক্ষুনি কেমিস্টের দোকানে দিয়ে এসো না ফেরত এটি।

বেলাদি টুথপেস্ট মনে করে কিনেছিলেন ওটি। এরকম ভুল প্রায়ই হয়। দোকানে সাজানো জিনিস থাকে, নিজে তুলে নিতে হয়, দাম দিতে হয়, সাধারণত—টুথপেস্ট মনে করে সানট্যান লোশন আনা মোটেই অসম্ভব নয়।

কিন্তু কেমিস্টের দোকানে গিয়ে ডিম চাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি বৈ কি। তাও ঘটেছিল আমাদের বন্ধু ইসমতুল্লা আনসারির ভাগ্যে। ও কিনতে বেরিয়েছিল ডিম —এসেছে দু সপ্তাহ হল লাখনৌ থেকে।



ফিঞ্চলী রোড টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাঁদিকে দু একটা দোকানের পর হল কেমিস্টের দোকান—আর তার পাশেই মাংস ডিম ইত্যাদির দোকান। দোকানের শো-কেসে রয়েছে ডিম সাজানো।

ও ভুল করে ঢুকে পড়েছে কেমিস্টের দোকানে। কেমিস্টের দোকানে খাতা পেন্সিল ক্যামেরা রবারের বল ডায়েরী স্যুটকেস ফিল্ম এ সমস্ত পাওয়া যায়—কিন্তু কোন কারণে ইংল্যাণ্ডে এরা ডিম বিক্রি করে না। এরা হলুদ, দারুচিনি, লঙ্কার গুঁড়ো পর্যন্ত বিক্রি করে। কিন্তু ডিম নয়। কেমিস্টদের দেখলে মনেই হয় না এরা ডিমের নাম শুনেছে কখনো।

আনসারি একটি মহিলা শপ অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে বলেছে, গোটা ছয়েক ডিম দাও তো ?

ডিম ? তুমি ডিম চাও ?

আনসারি জবাব দিয়েছে ঃ চাই বই কি—আলবত চাই। আমি ডিম কিনতে এসেছি—ডিম কিনব, তুমি ডিম বেচবে।

না, আমি ডিম বেচব না। পাশের দোকানে যাও, ওদের কাছ থেকে ডিম পাবে।

আমি ডিম কিনব এবং এখান থেকেই কিনব। না কিনে নড়ব না।

ভদ্রমহিলা বললেন, পয়সা দাও আমি দিচ্ছি। পয়সা নিয়ে পাশের দোকানে গিয়ে ছটা ডিম কিনে এনে আনসারির হাতে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, এর পর থেকে যখন ডিম কিনতে আসবে তখন ঐ দোকানে যেও।

আনসারি ভুল বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠেছিল লজ্জায়।

খুব সাবধানী লোক আমাদের হুলুদা (দেবব্রত চক্রবর্তী)। হুলুদাও একটি কেমিস্টের দোকানে গিয়েছেন—তিনি কিনবেন এক টিউব দাড়ি কামাবার সাবান। দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, উইথ ব্রাশ অর উইদাউট ব্রাশ ? (অর্থাৎ যে সাবানের টিউব নেবে, সে সাবান হাত নিয়ে গালে সোজাসুজি ঘষতে পারো—ব্রাশের প্রয়োজন নেই একেবারে—অথবা যে সাবানে ব্রাশের প্রয়োজন হয়, তেমন টিউবও আমরা রাখি।)

তুলুদা ভাবলেন, উইথ ব্রাশ—অর্থাৎ এরা টিউবের সঙ্গে ব্রাশও বিক্রি করবার তালে আছে। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, অফ কোর্স, উইদাউট ব্রাশ!

বাড়িতে এসে জল দিয়ে ব্রাশ দিয়ে তুলুদা যত চেষ্টা করেন, কিছুতেই ফেনা হয় না। অবশেষে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। প্যাকেটের উপর লেখা আছেঃ ব্রাশ ব্যবহার করতে হয় না। উইদাউট ব্রাশ!

কোলকাতায় যে জিনিস প্রত্যেক বাড়িতে আছে তা লণ্ডনের প্রায় কোন বাড়িতেই নেই—জিনিসটা কি? আরশোলা? ছারপোকা? এগুলো দেখতে পাওয়া যায় না বটে তেমন, কিন্তু একেবারে অদৃশ্য নয়। জর্জ অরওয়েল লিখেছেন তাঁর বইতে যে টেমস নদীর উত্তরে কোন কারণে ছারপোকা নেই—কিন্তু দক্ষিণ দিকে আছে। এর কারণ কি জানা যায় না। টেমস তো ঐটুকু একটা নদী, সেজন্য ছারপোকাদের কী অসুবিধে হয় বুঝি না। কোলকাতায় যে জিনিস প্রত্যেক বাড়িতে আছে সে হ'ল সমতল ছাদ। লণ্ডনের ছাদ সমতল নয়। তার উপরে বসা যায় না, আড্ডা মারা যায় না।

লণ্ডনে কোলকাতার মত ছাদ করা হয় না, তার কারণ হ'ল স্নো। স্নো যাতে পড়ে পড়ে ছাদের উপর জমে না যায় সেজন্য ছাদ এমন করে তৈরি যে স্নো কিছু জমে গেলেই পড়ে যায় আপনা-আপনি। আমাদের দেশের করুগেটেড টিনের চালের মত।

ছারপোকার কথায় মনে পড়ে গেল একটি বাঙালীর কথা। লিণ্ডফীল্ড গার্ডনসে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো সে। তার কাজ ছিল নানা বিষয়ে ফেল করা। শুনেছি সে ভাল রান্নাও করত। একদিন সে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে বললো, বড় বিপদে পড়েছি, পাউণ্ড দুয়েক চাল হবে? আমি রান্না ঘর থেকে এক পাউণ্ড চাল এনে দিলাম। দু পাউণ্ড দেবার মত চাল ছিল না।

রাত তখন দশটা।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে এসে বললো, খানিকটা মাখন পেলে ভাল হত।

মাখন তাকে দিলাম খানিকটা।

আরো একটু পর এসে বললো গোটা চারেক আলু যদি··· ।

তাও দেওয়া গেল।

সে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করল। বিনয়ের অবতারের মত অনেকটা কথাবার্তা বললো। আরো বললো পরদিন সকালেই সমস্ত সে ফেরত দিয়ে যাবে।

কথা রাখেনি সে। তার পর থেকে ওর কথা মনে হলেই ছারপোকার কথা মনে পড়ে। টিপে মারতে ইচ্ছে করে। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, আলোচনা করেছি। আমার এক বন্ধু বলেন—এর জন্য দুঃখের কিছু নেই। একজন বাঙালী ধার নিয়ে শোধ দেয়নি এটাই স্বাভাবিক—অথাৎ বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। আর যদি সে লণ্ডনে যায় তাহ'লে সে তার বাঙালী বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। অতএব এগুলো সহ্য করতেই হবে। মণি পালিতেরও একই অভিজ্ঞতা তিনি প্রচুর ধার দিয়েছিলেন বহু বাঙালীকে, কিন্তু তারা খুব কমই শোধ দিয়েছে! আমরা পরে দেখেছি বাঙালীদের মধ্যে এমন এক একজন কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেন, মামা দাদা দিদি সম্পর্কে পাতান এবং নানা সুবিধে করে নেন। ওঁরা ইংরিজি খাদ্য মুখে তুলতে পারেন না বলে প্রায় রোজই ভারতীয়দের ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়ান যদি কিছু খাদ্য জোটে এই আশায়, ওঁরা ধার করেন—দেশে স্ত্রী না খেয়ে আছে, ছেলেরা পকেট কাটা ধরতে বাধ্য হচ্ছে এ সমস্ত কথা বলেন। এ বিষয়ে এক ওস্তাদের কথা বলছি। এঁর বহু ছদ্মনাম—কখনো ইনি প্রভু বসাক, কখনো উষা রায়। অনেক বাঙালী সযত্নে বাঙালীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন—কিন্তু এই প্রভু বসাক বা উষা রায় জাতীয় লোক যে এজন্য অনেকখানি দায়ী সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই প্রভু বসাক বা উষা রায়ের এক দু পাউণ্ডে চলত না, ইনি দশ পাউণ্ডের কম ধার

করতেন না, এবং তারপর সে মুখ আর দেখা যেত না। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতেন, এই জোচ্চোরটি কোথায় আছে জানি না। শুনেছিলাম কার কাছ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড ধার করে জাহাজে করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। এখন তিনি কিভাবে লোকেদের কাছ থেকে ধার করছেন জানতে ইচ্ছে হয়।

কিছু কিছু বাঙালী এখনো ভাল আছেন এটাই ভরসার কথা।

কৃষ্ণ মেনন একবার ছাত্রদের সভায় বলেছিলেন, তোমরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূতের মত। তোমরা যা করবে তার ফলেই নির্ভর করবে আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক। আমরা যারা মাইনে করা রাষ্ট্রদূত তাদের চেয়ে ছাত্রদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

দায়িত্বহীনতা আমাদের প্রচুর। এগুলোর নানারকম উদাহরণ দেওয়া যায়।

ইংরেজদের একটা গুণের কথা জানি, সেটা হল তাদের ব্যবসায়িক সততা। তারা কথার দাম দেয়, খারাপ জিনিস দিলে তা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু ভারতীয় দোকানে ঠিক তার উল্টো দেখতে পাই। কোন জিনিস দোকানদারেরা ইচ্ছে করেই খারাপ দেয়, অতএব তা ফেরত দেয় না। আমাদের প্রায় প্রতিটি খাদ্যে ভেজাল আমরা খাচ্ছি। ক্ষতি আমাদের যে দেহের হচ্ছে তা নয়, জাত হিসেবে আমরা ভেঙে গিয়েছি বলেই এর বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক প্রতিরোধ নেই। তাই একে বলা চলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

যে ইংরেজ দোকানদার হাসিমুখে খারাপ কোন জিনিস ফিরিয়ে দেয়, তখন হয়তো কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু এটা তার পক্ষে একটা ইনভেস্টমেণ্টও বটে। ক্রেতা সেই দোকানে নিশ্চিন্ত মনে জিনিস কিনতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজ সৎ বলেই যে এটা করে তা নয়। ইংরেজ জানে, এর ফলে তার লাভই বেশি হবে। কেবল সে নয় তার ছেলেও যাতে সে ব্যবসা বজায় রাখতে পারে সেজন্য সে ছেলেদেরও সততাই শিক্ষা দেয়। ব্যবসার জন্যই সততার প্রয়োজন।

আমার দু-একজন বন্ধু লণ্ডনে হঠাৎ একটা বিরাট ব্যবসার সুযোগ জুটিয়ে ফেলে। কার্পেট তৈরি করবার জন্য বাজে উল কেনা হয়—বাজে উল ফেলা যায় না, সেগুলোও বিক্রি হয়। হিসেব করে দেখা গেল দশ বারো হাজার টাকা খরচ করলে ত্রিশ হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু দশ বারো হাজার টাকা ছিল না, অতএব হাজার পাঁচেক টাকা অগ্রিম চাওয়া হল।

যে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করার কথা তারা বললো, আগে জিনিস ডেলিভারি দাও, পরে দাম দেব। বিল অফ লেডিং দেখিয়েও টাকা পাওয়া যাবে না বলে তাঁরা জানালেন, কারণ ইতিপূর্বে আর একটি ভারতীয় কোম্পানি উলের সঙ্গে পাটের ভেজাল দিয়ে তাদের আশী হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে—অতএব তাঁরা রিস্ক নিতে রাজী নন।

আমরা লিণ্ডফিল্ড গার্ডনসে বেশ কিছুদিন ছিলাম—অথচ মিসেস হেইসকে চান করতে দেখিনি। এ ব্যাপারে খুব অবাক হতাম, বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি নিজেই একদিন বললেন যে তিনি পাবলিক বাথে নিয়মিত চান করেন। বাড়িতে সুন্দর চানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাইরে গিয়ে চান করেন কেন জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, তাঁর বয়স বেশি হওয়াতে তিনি পেনশন পাচ্ছেন গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে। যাঁরা বৃদ্ধ বয়সের পেনশন পান তাঁরা সাধারণ স্নানাগারে কোনো খরচ না দিয়ে চান করতে পারেন এবং সোম থেকে বৃহস্পতিবার এই চার দিন বিনা খরচে যে কোন সিনেমা হলে ঢুকতে পারেন। মিসেস হেইস প্রচুর সিনেমা দেখতেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সিনেমা দেখা নয়, বাড়িতে আগুন জ্বেলে খরচ না করা।

সাধারণ স্নানাগার লণ্ডনে প্রচুর আছে। আমাদের একটি পোল্যাণ্ডের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পিকাডিলি পাড়ায়—নাম তার বব। বব সমস্ত রাত পিকাডিলিতে ঘুরে বেড়াত—তার সামান্য কিছু পয়সা ছিল তাতে হোটেলে থাকা যেত না। অতএব সে দুপুর বেলা ছ-সাত পেনি খরচ করে চানের টবে গরম জলে ঘুমিয়ে নিত

ঘণ্টা কয়েক। স্বাস্থ্য তার খুব ভাল ছিল—এবং পিকাডিলিতে সমস্ত রাত ঘুরেও তার কোন রকম অসুবিধে হত বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া পিকাডিলির খুব কাছেই কভেণ্ট গার্ডেন—সেখানে শাক-সব্‌জীর পাইকারী বাজার—রাত্রি বারোটার পর গ্রাম থেকে আসে লরিতে করে শাক-সবজী ফল ফুল ইত্যাদি। সেখানে তার সঙ্গীর অভাব হয় না। মাঝে মাঝে এর ওর বোঝা বয়ে দিয়ে তার দু-চার শিলিং আয়ও হয়েছে—কিন্তু সে বেআইনীভাবে। তার বোঝা বওয়ার অধিকার নেই। বোঝা বইতে হ'লে ইউনিয়নের কাছে আবেদন করতে হবে। তারা বিদেশীকে কাজ করতে অনুমতি দেবে না। আর বব নিয়মিত কাজ করতে চাইতও না। অনিয়মই ছিল তার কাম্য। দু-একবার ইংরেজ "টেডি বয়"দের সঙ্গে তার ঘুষোঘুষিও হ'য়েছে।

ববের সবচেয়ে ভাল লাগে ইংরেজ পুলিস। রাত দুটোর সময় পুলিসের সঙ্গে ববের দেখা ট্রাফালগার স্কয়ারে। এখানে কি করছ—বাড়ি যাও! পুলিস বলে চলে গেছে। আর কিছু বলেনি। পরদিন সেই পুলিসের সঙ্গে একই জায়গায় একই অবস্থায় দেখা। কী হে, তোমার বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি নেই।

—হুঁ বাড়ি নেই, বটে? আমার সঙ্গে এস।

বিনা আপত্তিতে বব পুলিসের সঙ্গে যায়। থানাতে শোবার বন্দোবস্ত নাকি খুব ভাল।

দু-চারদিন জেলও খেটেছে।

ছেলেটি কিভাবে পোল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনে এসেছিল জানি না। তার কোন পরিচয় সে জানাতো না। তার মাথা হয়তো খুব সুস্থ ছিল না। কিন্তু এই রকম ছেলেরা লণ্ডনের দুর্বৃত্তদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। লণ্ডনে নানারকম দুর্বৃত্ত আছে। বিশেষ করে সোহো অঞ্চলে দুর্বৃত্তদের ঘাঁটি আছে। এই সব দলে পৃথিবীর সবাইকে পাওয়া যায়। এরা বন্দুক রিভলভার পছন্দ করে না। দাড়ি কামানোর ক্ষুর এদের খুব

প্রিয়। এতে কাজও হয় আর পুলিস এই অস্ত্রকে বে-আইনী বা অস্বাভাবিক মনে করতে পারে না। তবে লণ্ডনের এই আণ্ডারওয়ার্লড অধিকাংশ লোকেদের অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে না। ভারতীয় ছাত্ররা সাধারণত সন্ধ্যের পর এ পাড়ায় আসে না, যদিও কাছেই লণ্ডন ইউনিভার্সিটি। আমাদের এক বন্ধু দেবব্রত চন্দ্র সোহোর ভেতর দিয়ে না গিয়ে প্রায়ই আধ মাইল বেশি হাঁটতো। সে বলতো, গোলমাল থেকে দূরে থাকাই ভালো। আমরা বহুবার সোহোর মধ্যে গোলমাল দেখবার আশায় গিয়েছি, কিন্তু কোনদিনই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি।—বোধ হয় একেবারেই পড়েনি বললে ভুল হবে।

একদিন সোহো স্কয়ারের মধ্যে পার্কে সন্ধ্যের কিছু পরে দেখেছিলাম দেবব্রতকে। এইটেই আমাদের কাছে ভয়ানক অস্বাভাবিক লেগেছিল!

দেবব্রত বলেছিল, সব বাজে কথা, না রে? কই, কেউ তো ক্ষুর নিয়ে তাড়া করল না?

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের একটি গল্প আছে—সেটি এখন পৃথিবী-বিখ্যাত। গল্পটির নাম ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড। একই লোকের কাহিনী। ওষুধ খেয়ে ডক্টর জেকিল হ'তেন মিস্টার হাইড। ডক্টর জেকিল ভদ্র, কিন্তু মিস্টার হাইড পিশাচ। একই মানুষের মনের এই ছু-রকমের ভাবই আছে। ডক্টর জেকিল দয়ার অবতার, কিন্তু মিস্টার হাইড খুনে। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়, একই লোক কেমন করে তার চেহারা পর্যন্ত ওষুধ খেয়ে পালটে ফেলতে পারে? কিন্তু যাঁরা লণ্ডনে অন্তত এক বছর থাকেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাও সম্ভব। গ্রীষ্মকালের লণ্ডন প্রকৃতির রূপসাজ, ফুল গাছের সবুজ পাতায় মৌমাছির গুঞ্জনে, খোলা হাওয়ার থিয়েটারে, টেমস নদীর ধারে, হাইড পার্কে বা রীজেণ্টস পার্কের কনসার্টে, বিদেশী লোকদের গল্পগুজবে হাসিতে লণ্ডনের একরকম সাজ কিন্তু শীতকালে

লণ্ডন বদলে যায়। ডক্টর জেকিল যেমন বীভৎস হয়ে মিস্টার হাইডের রূপ গ্রহণ করে, লণ্ডন তেমনি হ'য়ে পড়ে।

ঠাণ্ডা, স্নো, তুষার-গলা জল, তার সঙ্গে ধুলো মিশে কাদার সৃষ্টি হয় কিন্তু সেগুলো সহ্য করা কঠিন নয়। সহ্য করা কঠিন লণ্ডনের কুয়াসা। সে কুয়াসা দার্জিলিঙের সাদা কুয়াসা নয়। লণ্ডনের কুয়াসার রঙ হলুদ। কুয়াসায় বাস থেমে যায়, ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়, এরোপ্লেন নামতে পারে না। এই ধোঁয়া আর কুয়াসার ফলে ফুসফুসের নানারকম ব্যাধি হয়, বহু লোক মারা পড়ে। কুয়াসা লণ্ডনের অভিশাপ। কুয়াসা হ'চ্ছে মিষ্টার হাইড। এই সময় দুর্বৃত্তেরা তৎপর হয়ে ওঠে, অন্ধকারের সুযোগে রাহাজানি হয়, পুলিশ সেখানে নিরুপায়। খুব শক্তিশালী আলোও কয়েক গজ দূর থেকে দেখা যায় না। হঠাৎ কুয়াসায় আটকে পড়া বাসগুলি চলে ধীরে ধীরে—সামনে কণ্ডাক্টর মশাল জ্বেলে চলে। তাতে পথ দেখা যায় না, কিন্তু মশালটা একটু চোখে পড়ে।

এমন কুয়াসা বেশিক্ষণ থাকে না। সাধারণতঃ আট দশ ঘণ্টা বা একদিনের মধ্যেই চলে যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের কুয়াসা লণ্ডনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে প্রায় চার হাজার লোক মারা পড়ে দম বন্ধ হয়ে। এর স্থায়িত্ব ছিল তিনদিনের বেশি। গোরু, ভেড়া, শূয়োরদের প্রদর্শনী হচ্ছিল তখন লণ্ডনের অলিম্পিয়া হলে (এভনমোর রোডের খুব কাছে) কয়েকটি গোরু তাতে মারা পড়ে। হাজার হাজার গাড়ি লোকেরা রাস্তায় ফেলে চলে যায়, অফিসে লোকেরা দেরি করে আসে, কোন লোক বাড়ি থেকে বের হ'তেই ভয় পায়। এই ধরনের কুয়াসার নতুন নামকরণ হয়েছে smog—smoke এবং fog এর সমন্বয়। Smokeই বেশি বলে মনে হয়। কুয়াসা সম্পর্কে প্রচুর কথা হ'য়েছে লণ্ডনে। চার্লস ডিকেন্স কুয়াসার অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন। টি-এস-এলিয়ট কুয়াসা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। আবহাওয়া বিশারদেরা কুয়াসার পূর্বাভাষ খবরের কাগজে, রেডিওতে প্রচার

করেন। বার বার প্রচার করা হয় রেডিওতেঃ কুয়াসা আসছে··· সাবধান।

কুয়াসা কেমন করে আসে ? একবার তাও দেখেছিলাম। আমি এবং নটরাজ শর্মা শেফার্ডস বুশ থেকে বাড়ি ফিরছি হেঁটে। রাত্রি তখন বারোটা। দূরত্ব তিন মাইলের বেশি। বাস সমস্ত চলে গিয়েছে, টিউব বন্ধ হয় হয়। পরদিন ছুটি, অতএব নিশ্চিন্তে আমরা কোন এক বিষয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করতে করতে পথ হাঁটছিলাম। কিছুদূর এভাবে হাঁটবার পর নটরাজ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললো, স্টপ ! স্টপ !

অর্থাৎ আমার মতামত তার সহ্য হচ্ছিল না। আমার মত গ্রহণীয় নয় একেবারেই, অতএব স্টপ ! অর্থাৎ অমন কথা বলা বন্ধ করো !

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটি ট্যাক্সি যাচ্ছিল—শর্মার উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে স্টপ ! স্টপ ! বলাতে ট্যাক্সি থেমে পড়ল। শর্মা হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল। এমন সময় এমন একটা কাণ্ড সে আশা করেনি। ট্যাক্সিতে গেলে দশ মিনিটে বাড়ি পৌঁছে যাব, এবং এত কম সময়ে তর্কের কোন মীমাংসা হবে না মনে করে দুজনেই দমে গেলাম। কিন্তু তবু আমরা ট্যাক্সিতে বসলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে হতাশ করতে ইচ্ছে হ'ল না।

ট্যাক্সিতে আমরা আধ মিনিট উঠেছি মাত্র, অল্প একটু চলেছে হঠাৎ একেবারে অ্যাবাউট টার্ণ! এজওয়ার রোড চওড়া ছিল—ড্রাইভার অতর্কিতে ঘুরিয়ে নিয়েছে। ড্রাইভার বললোঃ নেমে পড়—আমি যাব না।

নটরাজ আমাকে বলল, ব্যাটা মদ টেনেছে নিশ্চয়।

আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, নামব না !

ড্রাইভার বললো, ব্লাইমি। (কি বিপদ !) কুয়াসা আসছে—তার ভেতর দিয়ে গাড়ি যাবে না।

আমরা আবার ফুটপাথে দাঁড়ালাম। বলতে হয় পথে বসলাম,

কারণ একটি ঘন কুয়াসার দেওয়াল আমাদের ঘিরে ফেলল। ট্যাক্সি ড্রাইভার পালিয়ে গেল বিদ্যুৎগতিতে।

কুয়াসার দেয়ালটা আস্তে আস্তে এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। আলোকিত জায়গাটি হঠাৎ এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। তর্ক ভুললাম।

এবার ?

নটরাজ শর্মা উদ্বেগের সঙ্গে বললো, এবারে আর বাড়িতে পৌঁছুনো যাবে না। কিছু দেখা যাচ্ছে না। এ কুয়াসা কখন যাবে কেউ কখনো বলতে পারে না।

আস্তে আস্তে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। লণ্ডনের ফুটপাথ কোলকাতার মত নয়, প্রতি দু ফুট দূরে সেখানে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয় না··· ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যজনক বলেই এখানে উল্লেখ করলাম। অনেকেই এজন্য ইংরেজদের বুঝতে পারেন না। ফুটপাথে যদি গর্ত না থাকবে তাহলে অদৌ ফুটপাথ রাখা কেন? কিন্তু যে কোন পরিবেশে মানুষ নিজেকে মানিয়ে নেয়, অতএব গর্তহীন ফুটপাথকেও আমরা মানিয়ে নিয়েছিলাম। নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা হাঁটছি। সে পথের শেষ নেই বলেই মনে হল। আলো



স্টিভেনশনের ভাষায় glimmered like carbuncles—বোধ হয় মিনিট পনরো চলেছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল কথাবার্তার আওয়াজ।

এই রাত দুপুরে হঠাৎ তা অসম্ভব বলেই মনে হল। একটু এগিয়েই বুঝতে পারলাম যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক। একটা সারারাত খুলে রাখা 'স্ন্যাকবার' সেটি—তাতে প্রচুর লোকের সমাবেশ। প্রত্যেকেই বিস্বাদ চা খাচ্ছে আর কাশছে। কাশছে অবশ্য কুয়াশার জন্য। সেখানে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম আর বিস্বাদ চা খেতে

লাগলাম। বিস্বাদ না হলে সম্ভবত ইংরেজরা সেটাকে চা বলেই মনে করে না।

সেখানে দু-চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ হল। বিপদে ইংরেজরা ভুলে যায় যে জাত হিসেবে তাদের গম্ভীর থাকবার কথা, আলাপ না করিয়ে দিলে কথা বলা উচিত নয়। তারা তখন প্রগলভ হয়ে ওঠে—কথা কইতে শুরু করে। খুব খারাপ আবহাওয়া, তাই নয় ?—একজন পঁয়তাল্লিশ বছরের যুবক জিজ্ঞেস করলো আমাকে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বা অনেক সময় পঞ্চান্ন বছর বয়সের লোকও বিলেতে ইয়ংম্যান। আমি উত্তর দিলাম, না বেশ ভালই তো লাগে এই রকম আবহাওয়া। শুনে ইংরেজটি আর কথা বললেন না। লণ্ডনের আবহাওয়াকে খারাপ না বললে যে চটে না সে ইংরেজই নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভদ্রলোকের কাছে প্রচুর ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। বললাম লণ্ডনটা নরকের সমান। এমন আবহাওয়া শয়তানেরই কেবল পছন্দ হ'তে পারে। এই শুনে ইংরেজটি বেজায় খুশী। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাকিস্তানী ? আমি বললাম, না আমি ভারতীয়।

প্রায়ই এমন প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। পাকিস্তান ব্যাপারটা বহু ইংরেজ ঠিক বুঝতে পারে না। তাদের ধারণা ও-দুটি একই দেশ। ভারতীয় মানেই পাকিস্তানী, পাকিস্তানী মানেই ভারতীয়। আমরা বলি, তাই ছিল বটে কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন ভারতবর্ষ ছোট হ'য়ে গেছে—সমস্যা আরো বেড়েছে। সীমান্ত-সমস্যা, জলসমস্যা ইত্যাদি।

ঘন কুয়াসায় পথ চলা যায় না, অথচ বাড়িতে পৌঁছুতেই হয়। আমি এবং নটরাজ বাড়ির পথ খুঁজতে আবার চেষ্টা করলাম স্ন্যাকবার থেকে বেরিয়ে। কিন্তু হাঁটাই সার হল। কয়েক ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরলাম—একই পথ ধরে কত যে ঘুরপাক খেলাম তার আর সংখ্যা নেই। অবশেষে রাস্তার ধারের একটি বেঞ্চে শ্রান্ত হয়ে বসে বসে

ঘুমুতে লাগলাম। পরদিন সকালে কুয়াসা কেটে যাওয়াতে দেখতে পেলাম আমরা বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে একটা কবরখানার কাছে বসে আছি। এই কবরখানাটির সামনে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউণ্ড।

কুয়াসার অনেক গল্প আছে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছাড়াও অন্য গল্প। গভীর কুয়াসায় গাড়ি সব আস্তে আস্তে চলছে। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির পেছনের আলো দেখে এগুচ্ছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ সামনের গাড়িটি থেমে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ—পেছনের গাড়িচালক তখন অস্থির হয়ে উঠেছে—বলছে, কী হ'ল, এখানে হঠাৎ গাড়ি থামল কেন? উত্তর এলো। গাড়ি হঠাৎ থামেনি—আমি ইচ্ছে করেই থামিয়েছি, কারণ এটা আমার গ্যারেজ।



আর একটি ঘটনা—কুয়াসায় দিক্‌ভ্রান্ত একজনকে দেখে অন্য একজন অপরিচিত লোক বললো, আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি যাব প্যাডিংটন স্টেশনে।

—আমার হাত ধরে এসো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

প্যাডিংটন স্টেশনে পৌঁছে দিল লোকটা অতি সহজেই। অবাক হয়ে গেল লোকটি। বললে, আপনি নিশ্চয়ই এই ঘন কুয়াসাতেও স্পষ্ট দেখতে পান?

লোকটি উত্তর দিয়েছিল: না, তা নয়। এমন ভাবে যাওয়া আমার অভ্যেস আছে—কারণ আমি অন্ধ।

লণ্ডনের বেশি পাড়ায় আমি থাকিনি। স্ট্যানমোর, এজওয়ার, মিলহিল, টটেনহ্যাম, হ্যারিঙে, ইলফোর্ড, গ্রীনিজ, টুটিং, ক্ল্যাপাম, রিচমণ্ড, উইম্বলডন, ঈলিং, হেন্ডন, কেণ্টন, পপলার ইত্যাদি কত পাড়া যে আছে তার হিসেব নেই। লণ্ডনে সাতাশ হাজারের বেশি রাস্তাই আছে—রাস্তাগুলির নাম প্রচুর পরিমাণেই বিদেশী। আবিসিনিয়া রোড, অ্যারিস্টটল রোড, বাটাভিয়া রোড, ব্যাভেরিয়া

রোড, বেঙ্গল রোড, বেরমুডা ষ্ট্রীট, বর্নিও ষ্ট্রীট তো আছেই, এমনকি মস্কো রোড পর্যন্ত আছে। মস্কো রোডটি বেজওয়াটার টিউব স্টেশনের কাছেই। সেখানে আমি জাহাঙ্গীর আংকেলসেরিয়ার সঙ্গে একটি ক্লাবে যেতাম। জাহাঙ্গীর জাতে পার্শি, ধর্মে কমিউনিস্ট-বিরোধী। অভিনয় করার দক্ষতা ছিল, বি-বি-সি-তে টেলিভিশনে কিছু অভিনয় করেছে। কিন্তু তার কমিউনিস্ট এবং কমিউনিজম সম্পর্কে এত ঘৃণা ছিল যে মস্কো রোডে কখনো যায়নি। ঐ রাস্তাটির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার জন্য সে অপর দিকের ফুটপাথ দিয়ে যেত। আমরা তাকে এই ব্যাপারে খুব ঠাট্টা করতাম। বলতাম, জাহাঙ্গীর, একটি ফ্ল্যাট পাওয়া যাচ্ছে, দুখানি ঘর—ঠাণ্ডা জল গরম জল সব পাওয়া যায়, নিজস্ব ফোন আছে, কার্পেট দেওয়া মেঝে, ভাড়া মাত্র তিন পাউণ্ড। ফ্ল্যাটটা নেবে?

জাহাঙ্গীর বলতো, নিশ্চয় নেব। কোথায়?

—মস্কো রোডে।

জাহাঙ্গীর তা শুনে মারতে আসত। বলতো, এমন ঠিকানায় আমি কিছুতেই থাকব না।

লণ্ডনের প্রতিটি পাড়ার বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আছে প্যারিসে বার্লিনে বা কোলকাতায়। কিন্তু চার্চ এবং মদের দোকান সব পাড়াতেই এক রকম মনে হয়েছে। চার্চগুলি সংখ্যায় এত বেশি কেন তার অর্থ প্রথমে বুঝতাম না, পরে বুঝেছি। চার্চগুলির মধ্যেও জাতিভেদ প্রচুর। ক্যাথলিক চার্চ, মেথডিষ্ট চার্চ, চার্চ অফ ইংল্যাণ্ড, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি নানা জাতের চার্চ আছে। কিন্তু মদের দোকানে যেমন বিক্রি কমছে বিশেষ করে বীয়ার, তেমনি চার্চেও লোক কম যাচ্ছে। বেকার না হ'লে চার্চে যাবার কি প্রয়োজন আছে? চার্চে অবশ্য গিয়ে এককালে প্রচুর লোকে বিয়ে করত, এখন তা কমে যাচ্ছে। চার্চের বদলে হয় টাউন হলে। চার্চগুলির আয় হয় সবচেয়ে বেশি তখন, যখন দেশের লোকেরা বেশি মাত্রায় বেকার হয়। বেকার হ'লে লোকে দুর্বল হয়ে পড়ে, বলে, ভগবান আমাকে একটা চাকরি দাও। চার্চে গিয়ে

রীতিমত প্রার্থনা শুরু করে। অবস্থা খুব খারাপ হ'লে হত্যে দিয়ে পড়েও থাকবে হয়তো কাতারে কাতারে লোক। এজন্য চার্চের যাঁরা মোহান্ত তাঁরা চান যাতে দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়। আয় তাহ'লে বেশি হয়। শিক্ষিত হওয়াটাও তাই চার্চ পছন্দ করে না। কারণ শিক্ষিতেরা বড় অসুবিধাজনক প্রশ্ন করে বসে।

একটি অসম্ভব জিনিস আমার চোখে পড়েছে। একজন লোক বিনা চিকিৎসায় বা কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এদেশে মারা পড়লে তা নিয়ে এমন হৈ-চৈ করে ওঠে লোকেরা যে তা একজন ভারতীয় হিসেবে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। এর ফলে গভর্নমেণ্ট সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে, গভর্নমেণ্ট জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমন যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা করে। এতে গণতন্ত্রের দুর্বল দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামান্য মানুষের অবহেলায় মৃত্যুর জন্য যদি গদি ছাড়তে হয় তাহ'লে সে দেশের লোকেরা নিতান্তই কিম্ভূত তাতে আর সন্দেহ কি। লোকেরা না খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে, বৃষ্টিতে, কাদায়, জলে বিনা চিকিৎসায় বহু লোক মরলেও আমাদের দেশের গভর্নমেণ্ট কেমন টিঁকে থাকে। এ যে শক্ত গভর্নমেণ্ট তাতে আর সন্দেহ কি। ইংরেজদের উচিত আমাদের দেশে এসে এসব শিখে যাওয়া। আমাদের দেশের রীতিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা। কিন্তু ইংরেজের কি শেখবার মত সামান্য মাত্র বুদ্ধিও আছে ?

লিণ্ডফীল্ড গার্ডন্সে আমরা প্রায় এক বছর ছিলাম। মিসেস হেইসের পোশাক বা চরিত্র ওর মধ্যে পরিবর্তন হয়নি। আমাদের ভাড়াটে হিসেবে পেয়ে তাঁর ভালই লাগত। কিন্তু তাঁর ছেলে হলফোর্ড হঠাৎ স্থির করল আমাদের ঐ বাড়িতে সে অন্য একটি ভাড়াটেকে আনবে। তারা নাকি আরো বেশি ভাড়া দিতে রাজী হ'য়েছে। আমরা নোটিস পেলাম অতএব। আমরা কালো ব'লে নয়। যারা টাকার দাম বোঝে তাদের কাছে কালো সাদার ভেদ না থাকারই কথা।

কালো সাদার সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে নতুন করে চিন্তা করা হচ্ছে। ফ্যাসিস্ট মোসলের দল বলছে, বৃটেনকে সাদা রাখো। আন্দোলন করছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ তাদের তাড়াতে হবে। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করতেও ফ্যাসিস্টরা উস্কানি দেয়।

খুবই খারাপ। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতীয়রা খুব আনন্দ পায়। সায়েবরা যে ভারতীয়দের কালো মনে করে না এতে তারা খুব প্রীত। নিগ্রোদের জন্য খুব কম ভারতীয়ই সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলে। কালো বিরোধী আন্দোলন হ'লে ভারতীয়রা বড়জোর বলে, কী বিপদ, মামাদের জন্য আমাদেরও কবে বিপদ হয় কে জানে!

মামা, অর্থাৎ কালো আফ্রিকান বা জামাইকান। বাঙালীর আবিষ্কার এই কথাটি ব্যঙ্গ করে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বলা হয়। সাধারণদের জন্য নাচঘরে ভারতীয়রা সহজে যেতে চায় না, তারা নাচের বিরুদ্ধে বলে নয়, বা তাদের মেয়েদের সঙ্গে মিশবার ইচ্ছে নেই বলে নয়, কারণ সে সব নাচঘরে আফ্রিকানদের যাতায়াত।

কেবল যাতায়াত নয়—আফ্রিকান ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজ মেয়েরা বেশি নাচতেও চায় কারণ সাধারণত তারা নাচতে জানে, ভারতীয়রা নাচতে জানে না তেমন।

কালোর বিরুদ্ধে আক্রোশ ভারতীয়দেরই বেশি, সেটা আমি বিশেষ করেই লক্ষ্য করেছি। দিল্লিতে চার জন আফ্রিকান ছাত্রও দেখেছিলেন আমাদের ঘোরতর কালোবিদ্বেষ।

আফ্রিকানদের মামা বলা তাই আত্মীয় সম্বোধনে নয়। কথাটি মাউ মাউ নামক আফ্রিকার অনুন্নত সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেই তৈরি।

লণ্ডনে গিয়ে যখন ল্যাণ্ডলেডি কালো রঙ বলে কোন ভারতীয়কে ফিরিয়ে দেয় তখন রাগ না করে এই কথাটি যেন মনে রাখেন যে বর্ণবিদ্বেষ আমাদেরও কম নয়।

এর পর যে বাড়িতে গেলাম এবং তারপর আরো পাঁচ বছর ধরে কোন্ কোন্ বাড়িতে কেমন ভাবে ছিলাম তার ইতিহাস বলবার ইচ্ছে

রইল। আপাততঃ আমার কাহিনী এখানেই শেষ করছি। কারণ অনেক কিছু বলা হলেও অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। অতএব আসলে কাহিনীর কোনদিনই শেষ হয় না। আমি কাহিনী বলতে গিয়ে দেখছি ব্লেনিম ক্রেসেণ্ট সম্বন্ধে হয়তো আরো অনেকখানি বলা যেত। এভনমোর রোডেও তো আরো কত কি ঘটেছে সেগুলো বলা হ'ল না। এভনমোর রোডের কাছাকাছি অলিম্পিয়া একজিবিশন হল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিনি। তাছাড়া সুনীল চ্যাটার্জির ১৯৩১ সালে তৈরি এক ফোর্ড গাড়িতে চড়ে লণ্ডনের পথে পথে নানা কাণ্ড করে বেড়ানো (তুর্ঘটনা করতে করতে বেঁচে যাওয়ার প্রায় পঁচিশটি ঘটনা তু-ঘণ্টায় ঘটেছিল), আর বাঁয়া বোসের নানারকম আজগুবি গল্প। বাঁয়া বোসের আসল নাম কেউ এখন জানে না—বয়স তাঁর পঞ্চান্ন—বছর চল্লিশেক বিলেতেই আছেন।

লণ্ডনের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল প্রায় অবাধ স্বাধীনতা। আর ভাল লেগেছিল এর ছটি গরম কাল আর ছটি বসন্ত কাল। ভাল লেগেছিল সন্ধ্যের ক্লাসগুলি, যেখানে টিচারদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল প্রচুর। ছাত্ররা ক্লাসে পাইপ এবং সিগারেট বা চুরুট খেতে পারত। এত বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া আমি আর কোথাও কল্পনা করতে পারি না।

ভারতবর্ষ থেকে যে ইংল্যাণ্ডে প্রতি বছর প্রচুর ছাত্র যাচ্ছে তার এই একটা কারণ। আরো অবশ্য অন্য কারণ আছে। আমাদের দেশের টিচারদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় আছে। কিন্তু একেবারে অহেতুক বোধ হয় নয়। বুঝতে না পারলে কানমলা, চাঁটি, বেঞ্চের উপর দাঁড়ানোর ব্যবস্থা আমাদের দেশে।



অতএব ছাত্ররা বুঝতে না পারলেও বলে বুঝেছি; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে

গিয়ে নকল করতে না পারলে টেবিল চেয়ার ভাঙে। ইংরেজরা যে সবাই খুব শিক্ষিত হয় তা নয়, কিন্তু শিক্ষিত হতে তাদের বাধা নেই। স্বাধীন বৃত্তিগুলিকে দুমড়ে ভেঙে দেয় না তারা। আমাদের দেশে শিক্ষা বলে একটা জিনিস চলে—যা বিলিতিও নয়, এদেশীয়ও নয়। একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। সুকুমার রায় হয়তো একটা নামকরণ করতে পারতেন। তবে বিলেতে ক্লাসে সিগারেট চুরুট খাওয়ার জন্যই সে দেশের শিক্ষা ভাল তা বলছি না।

তবুও অধিকাংশ লোকেরই বিলেত দেশটা দেখা উচিত। বিলেত অ্যামেরিকা বা যে কোন বাইরের শিল্পে উন্নত দেশে থাকলে সে সব দেশ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়—সেই সঙ্গে ভারতবর্ষকেও চেনা যায় ভাল করেই। ভারতবর্ষকে চেনবার জন্যই ভারতীয়দের বাইরে যাওয়া উচিত এবং বেশ কিছুদিন থাকাও উচিত। অবশ্য আত্মসম্মান বজায় রেখেই সেটা করা উচিত। অনেকেই এখনো সায়েব দেখলে গদগদ ভাব—সে অফিসের মেসেঞ্জারই হোক বা হোটেলের ঝি চাকরই হোক। এই গদগদ ভাবটি যতদিন না কাটবে ততদিন আমাদের উন্নতিও হবে না, চরিত্রও গড়ে উঠবে না। ইংরেজদের মধ্যে অনেকগুলি ভাল জিনিস আছে—যেমন আছে জার্মানদের মধ্যে, রাশিয়ানদের মধ্যে বা অ্যামেরিকানদের মধ্যে, সেগুলি নিতে হবে—নকল নয়, গ্রহণ করতে হবে। তবে ভ্রমণ সার্থক হয়।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী রূপের বীভৎসতা যেমন খুলে ধরতে হবে, তেমনি তাদের দেশের শিল্পপ্রিয়তা, সাহিত্য, মানবিকতা বোধকেও প্রশংসা করতে হবে। নানাদিকে বিচার করতে হবে—নানা সময়ে, নানাভাবে। লণ্ডন বা প্যারিসকে বুঝতে চেষ্টা করতে তো হবেই—যেমন বুঝতে হবে মস্কো, ওয়াশিংটন বা পিকিংকে, কিন্তু ভুললে চলবে না আমাদের স্থান কোলকাতায়, দিল্লিতে বা বোম্বাইতে—এই ভারতবর্ষে। বিলেত দেশটা সম্বন্ধে নানারকম লেখা বেরিয়েছে। নানা ভাবে নানা লোকে দেখেছেন—এবং দেখা ফুরোয়নি, কোনদিনই ফুরোবে না।

নতুন ঘটনা, নতুন মানুষ নতুন ভাবে লিখবেন সে দেশের কথা। ইংরেজরা নিজেরাই তাদের দেশ সম্পর্কে কত বই যে বার করে তা একজনের পক্ষে পড়ে ফেলা সম্ভব নয়। নানা সমস্যার কথা, রাস্তার কথা, আলোর কথা, রোগের কথা, কালোবিদ্বেষ কথা, বেকার সমস্যার কথা। তারা নির্ভীকভাবে অন্তত নিজেদের মত প্রকাশ করে। অন্য দলের বলে তার মতামত প্রকাশে বাধে না। হাইড পার্কে কনসারভেটিভ থেকে আরম্ভ করে অ্যানার্কিস্ট পর্যন্ত সবাই পাশাপাশি বক্তৃতা দেয়। লোকেরা প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু বক্তাকে লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ে না। এই দেশে মানুষের জন্য নানারকম ব্যবস্থা আছে—যেমন আছে কুকুরদের জন্য। অনেকে অবাক হন এই ভেবে যে এদেশে কুকুর বিড়ালের এত খাতির কেন? তাদের জন্য এত খরচ করে পূর্ব আফ্রিকায় যে বৃটিশ প্রজা না খেয়ে মরছে বা ক্রীতদাসের মত অবস্থায় আছে তাকে বাঁচানো হয় না কেন? প্রশ্নটা ভাল এবং এমন প্রশ্ন করাও হয়। তার জন্য নানারকম কাগজ রয়েছে যেমন ডেলি ওয়ার্কার, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন বা নিউ স্টেটসম্যান। একথা বলাতে তাদের কেউ দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দেয় না।

ইংরেজরা বক্তৃতা দিতে ভালবাসে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সভা সমিতির বিজ্ঞাপনে। আমাদের দেশের মত সেখানে মেঠো সভা প্রায় হয় না। সভাতে বক্তৃতা শুনতে গেলে সাধারণত টিকিট লাগে। সাধারণত বক্তাদের বক্তব্য বলে কোন বস্তু থাকে। আমাদের সভার সঙ্গে তুলনা করা ভুল। আমাদের সভা সমিতিতে প্রায় সময়েই উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না, বিশেষ করে রবীন্দ্র জন্মতিথির সভাগুলিতে। শেক্সপীয়ারের দেশে শেক্সপীয়ার সম্পর্কে এত সভা হয় না, কারণ সেজন্য পড়াশুনা করতে হয়। একমাত্র বিশেষজ্ঞেরাই সেখানে বক্তৃতা দেন।

লণ্ডন সম্পর্কে এসবই হয়তো পুরনো কথা—আমাদের কাছে লণ্ডন এখন অতি নিকটে। খুব কম লোক আজকাল পাওয়া যায় যাঁরা লণ্ডনে যাননি বা যাবার কথা ভাবছেন না।

লণ্ডনকে অবশ্য ভোলা শক্ত। লণ্ডনকে পুরো চেনা যায় না, কিছু না কিছু রহস্য এর আছেই। যত বই-ই লেখা হোক, এর পুরো চরিত্র একদিনে ধরা পড়বে না। যেদিন পড়বে সেদিন লণ্ডনও পুরানো হয়ে যাবে। তাই লণ্ডনকে চেনাবার উদ্দেশ্যে আমি কিছু লিখছি না—সে চেষ্টা করা বোকামি। লণ্ডনের ল্যাণ্ডলেডিদের আমি কিছু চিনেছি, তারই বর্ণনা করতে গিয়ে সে প্রসঙ্গে কিছু অন্য কথা এসে গিয়েছে। এরপর আরো কয়েকজন ল্যাণ্ডলর্ড এবং ল্যাণ্ডলেডির বাড়িতে থেকেছিলাম। ভারতীয়রা প্রায়ই লণ্ডনে এবাড়ি থেকে ওবাড়ি বদল করে। অতি স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই সেগুলো ধরা হয়। সাধারণত একটি ট্যাক্সিতেই সমস্ত জিনিস নিয়ে যাওয়া যায়—নইলে কিছু পয়সা দিলে বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে অন্যত্র পৌঁছে দেবার প্রচুর প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল যে জিনিসপত্র ঠিকমত অন্যত্র পৌঁছে দেয় তাই নয়—এদের গুদাম আছে—সে গুদামে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জিনিসপত্র রেখেও দেওয়া যায়। মাসে পাঁচ ছ টাকা ভাড়া দিলে একটি পরিবারের সমস্ত জিনিসপত্র রেখে দেয়। আমরা কখনই এইরকম প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিইনি। কিন্তু যাঁরা লণ্ডন থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যান তাঁরা ওখানে তাঁদের জিনিসপত্র রেখে যেতে পারেন। কোলকাতাতে এমন প্রতিষ্ঠান হলে অনেকেরই যে যথেষ্ট সুবিধে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংল্যাণ্ডে এত বড় বড় ঢাকা লরি আছে যে সেগুলিকে দোতলা বাড়ির সমান উঁচু মনে হয়। তাতে খাট, বিছানা, সোফা, টেলিভিশন, আলমারি, বাক্স, রান্না ঘরের যাবতীয় সরঞ্জাম একসঙ্গে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া যায়। কোলকাতায় অবশ্য সেরকম লরি আনলে দু তিনটি রাস্তা ছাড়া আর কোথাও যাবে না। লণ্ডনের সমস্ত রাস্তাই মোটামুটি চলনসই—অর্থাৎ মোটরগাড়ি বা লরির যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না। লণ্ডন তৈরি করবার সময় কোন রকম ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়নি। এদিকে একরকম ওদিকে

একরকম খাপছাড়া ভাব আছেই। কিন্তু ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের আগে অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। গলি-ঘুঁজি খোলা নর্দমা এসব তো ছিলই, আর ছিল মহামারী, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা টাইফয়েড।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন গড়ে ওঠে না। ঐ সময়ে লণ্ডনটি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়। তারপর লণ্ডনকে মোটামুটি স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়। কৃস্টফার রেন এরপর লণ্ডনকে নানারকম বাড়ির নক্সা করে দিয়ে সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলেন। গলি-ঘুঁজি দূর হয়ে যায় মোটামুটি। কিন্তু কিছু গলির চিহ্ন এখনও আছে মধ্য লণ্ডনের কোথাও। কিন্তু তাদের সংখ্যা যৎসামান্য। এদের দূর করা যায়নি, সম্ভবত আর যাবেও না।

বড় শহরে দু চারটে গলি থাকা বৈচিত্র্যের দিক থেকে মন্দ নয়। লণ্ডনের এই পরিকল্পনাহীন বৈচিত্র্যে একজন আমেরিকান বলেছিলেন শহরটায় নানারকম অসুবিধে। সোজা রাস্তা খুব কমই আছে। একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন তার উত্তরে—ভগবানের অসীম করুণা যে লণ্ডন পরিকল্পনা করে তৈরি হয়নি।

লণ্ডনের লোকেরা পরিকল্পনা কথাটার বিরুদ্ধে সর্বদাই খড়্গহস্ত।

একবার স্থির হয় বাকিংহাম প্যালেসের ঘোড়াগাড়ি যাবার জন্য একটি গেট তৈরি করা। গেট তৈরি হলও, খরচ পড়ল প্রায় দশ লক্ষ টাকা। শ্বেত পাথরের গেটটি খুব ভালই দেখতে হল।

কিন্তু…।

কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি তার মধ্যে দিয়ে গেল না। যাবার কোন উপায় ছিল না। গেটটি ছোট করে তৈরি করা হয়েছিল।

পরিকল্পনা করা হয়নি। এখন সেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাকিংহাম প্যালেসের পেছনে আধমাইল দূরে।

নাম এর মার্বল আর্চ। লণ্ডনের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এই জিনিসটিকে লোককে দেখতেই হয়। এর চারিদিকে চলেছে অগুনতি মোটরগাড়ি। গোটা দশেক বাসরুট এর চতুর্দিকে।

মার্বল আর্চটির জন্য ট্র্যাফিক মন্থর হয়ে আসে।

অফিসযাত্রীরা তাই মার্বল আর্চকে পছন্দ করে না।

লণ্ডন তবু চলছে—এবং কখন কোথাও এর চাঞ্চল্য থাকলেও সামগ্রিক ভাবে এর ধীরগতিতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন—এমনকি কিছু কিছু ইংরেজ পর্যন্ত বলেন লণ্ডন বড়ই ধীর। কিন্তু লণ্ডনের আর একটা রূপ আছে সেটা সহজে চোখে পড়ে না। সেটা এর আণ্ডার-গ্রাউণ্ড। সেখানে গতি প্রচণ্ড। বাধাহীন গাড়ি ছুটে চলে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। কিন্তু সবটা মিলিয়ে লণ্ডনকে ভাল লাগে। একজন ভারতীয় যে ভাবে লণ্ডনকে ভালবাসেন, একজন আমেরিকান হয়তো সে ভাবে লণ্ডনকে ভালবাসেন না। লণ্ডনের প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছে, এবং হওয়া সম্ভব—কিন্তু তবু মনে হয় লণ্ডনকে অবিচার করা হয়েছে, কারণ নিরুপদ্রবে থাকবার মত এমন শহর পৃথিবীতে আর নেই।

অস্কার হ্যামারস্টাইন একদা প্যারিস সম্পর্কে গেয়েছিলেন,

The last time I saw Paris,
It was warm and gay
No matter how they change her
I'll remember her that way.

এই কথাটা আমি লণ্ডন সম্পর্কে বলতে চাই।
